

মাসুদ রানা

কলিচক্র

রাজা জালালায়ার শ্রাঙ্গন





মাসুদ রানা

সিরিজের অন্যান্য বই

ধ্বংস-পাহাড়	ভারত-নাট্যম
স্বর্ণমৃগ	দুঃসাহসিক
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা	দুর্গম দুর্গ
শত্রু ভয়ঙ্কর	সাগর-সঙ্গম—১
সাগর সঙ্গম—২	রানা! সাবধান ॥
বিস্মরণ	রত্নদ্বীপ
নীল আতঙ্ক—১	নীল আতঙ্ক—২
কায়রো	মৃত্যু-প্রহর
গুপ্তচক্র	মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র
রাত্রি অন্ধকার	জাল
অটল সিংহাসন	মৃত্যুর ঠিকানা
ফ্যাশা নর্তক	শয়তানের দূত
এখনো ষড়যন্ত্র	প্রমাণ কই ?
বিপদজনক—১	বিপদজনক—২
রক্তের রঙ—১	রক্তের রঙ—২
অদৃশ্য শত্রু	পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর—১	বিদেশী গুপ্তচর—২
ব্ল্যাক স্পাইডার—১	ব্ল্যাক স্পাইডার—২
গুপ্তহত্যা	তিন শত্রু
অকস্মাৎ সীমান্ত—১	অকস্মাৎ সীমান্ত—২
সতর্ক শয়তান	নীলছবি—১
নীলছবি—২	প্রবেশ নিষেধ—১
প্রবেশ নিষেধ—২	পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ—১	এসপিওনাজ—২

লালপাহাড়

গুণচক্র

এক খণ্ড সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

সিরিজের অত্যাশ্চর্য বই পড়া না থাকলেও মজা পাবেন

মাসুদালা

হাংকোং কাউন্টার
ইন্টেলিজেন্সের একজন
অন্যতম দুঃসাহসী স্মাইল
গোপন সিক্সল নিয়ে দেখে
বিশেষে ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে
সদে সদে তার মিসদ, বোম্বাষ্ট,
ভয় আর মৃত্যুর হাতছানি।

আজুলে এই দুর্ধর্ষ
হাংকোং মুহুরির
সাথে পরিচয় করা যাক

প্রকাশিকা :

ফরিদা ইয়াসমীন

সেগুনবাগান প্রকাশনী

১১০, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

সেগুন বাগান প্রকাশনী কর্তৃক

সর্বস্বত্ত্ব স্বঃস্বাক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৭০

দ্বিতীয় প্রকাশ : মে, ১৯৭০

তৃতীয় প্রকাশ : মার্চ, ১৯৭৭

প্রচ্ছদ : হাশেম খান

মুদ্রণে :

রুহুল আমিন

পলাশ মুদ্রণ,

২৪নং মোহিনীমোহন দাস লেন,

ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

যোগাযোগ ঠিকানা :

সেগুনবাগান প্রকাশনী

১১০ সেগুন বাগান, ঢাকা-২

জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

দূরভাষা : ২৫১০০২



GUPTACHAKRA

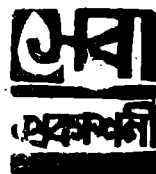
By

Qazi Anwar Hussain

মাসুদ রানা

গুণ্ডচক্র

কাজী আনোয়ার হোসেন



এই বইয়ের প্রতিটি ছোট্টা ও চরিত্র কাল্পনিক
জীবিত যা মত কোন ব্যক্তির কিম্বা যামুদ
কোন ছোট্টার সাথেএর কোনও সম্পর্ক নেই।

‘আলিয়ে খেল ছুঁড়ীটা।’

‘ডাইনী, নির্ধাৎ ডাইনী। ঔৎ করেছে বুড়োকে।’

‘তার চে’ চল ওকেই ঔম করে দি।’

‘আমার হাতে ছেড়ে দে—একেবারে ফিনিশ...’

চার বন্ধু একসঙ্গে চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে
আবার বসে পড়লো।

‘কিন্তু দোষ আসলে বুড়োর। ওই একটা পুঁকে মেরের কথায় আমাদের
মত পি. সি. আই.-স্কেম্-স্দের অপমান।’

‘না, অপমান সইবো না।’

‘সইবো না।’

‘কিছুতেই না।’

চারটে চা শঙ পড়লো চায়ের টেবিলে।

‘আমাদের হৃদয়টা নাকি কঠিন হয়ে গেছে।’

‘তাই বুড়ো খেই খেই করে নেচে সবার ক্রমে কবিতার বই পাঠালো।’

‘ক্লাওয়ার ভাসে ফুল।’

‘জানালায় নজ্রা করা পর্দা।’

চার বন্ধু হোঃ হোঃ করে উঠলো।

‘সেদিন ইন্টারকনে ওর সঙ্গে দেখা। ভদ্রতা দেখিয়ে হাসতে গেলাম। বললো কি না, আপনাদের দাঁতগুলো এত সুন্দর কিন্তু দাঁত ব্রাশ করেন না কেন?’

‘আমি সেদিন শুকে কফি অফ’র করলাম এখানে. বললো কি জানিস—বললো, ধন্যবাদ, তৃতীয় শ্রেণীর কফি অফ’রের জঙ্গে, কফি আমি খাই না!’

‘নবাবের বেটী এখানকার কফি তৃতীয় শ্রেণীর!’

‘চল, বৃড়োর কাছে চরমপত্র নিয়ে দি—হয় ও ছুঁড়ী থাকবে না হয় আমরা।’

চারজন শুধু হয়ে বসে রইলো।

পাকিস্তান কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স হেড কোয়ার্টারে তুমুল অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বিস্কোভ পি. সি. আই, চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খানের পার্সোনাল সেক্রেটারী মোহানা চৌধুরীকে নিয়ে। এদের বিস্কোভের কারণ, বছরখানেক হয় এ অফিসে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে মেয়েটি। এত বছরের ঐতিহ্য সব কিছু রাতারাতি পুরানো হয়ে গেল অফিসের? সব কিছু যেন বদলে যাচ্ছে। বিশেষতঃ মেজর জেনারেল রাহাত খান।...এই এক বছরে মেজর জেনারেলের চোখের মণি হয়ে উঠেছে মেয়েটি। একাই স্বপ্নের সব স্নেহ দখল করে বসেছে।

আসলে রাগের কারণ এটাই।

বন্ধ এই ছুকরীর সঙ্গে নাকি হেসে হেসে কথা বলে। এখন তার ঘরে কারো ডাক পড়লে মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তির উপর অন্ততঃ তিনটে কথা শুনিয়ে দেন। প্রত্যেকের ক্রমে একটা বুক-শেল্ফ দেওয়া হয়েছে। তাতে রেফারেন্স বই ছাড়াও কিছু কিছু কাব্য গ্রন্থও সাজিয়ে দেওয়া

হয়েছে। প্রত্যেকদিন সকালে টেবিলের ক্লাওয়ার ভাসে ফুল দেওয়া হয়। অফিসের ছাদে একটা বাগানও হয়েছে এ জন্ত।

সবার ধারণা, এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণ এই সোহান চৌধুরী।

সোহানা কারো সঙ্গে আলাপ করে না। নাসের আলাপ জন্মতে চেষ্টা করলে দু'টো কথা শুনিয়ে দিচ্ছে হেসে হেসে। এক এক দিন এক এক গাড়িতে করে অফিসে আসে। কোনোদিন ডজ, কোনোদিন মাসিডিস বেঞ্জ বা শেভ। উদ্দিপরা ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দিলে তবে গাড়ি থেকে নামেন নবাব পুরী। পোশাক পরে গাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে। অফিসে পোশাকের ব্যাপারে খুব ফর্মাল, কিন্তু বাইরে ওকে দেখা যায় একটা মান্তান হাঁকিয়ে বেড়াতে। ইন্টারকনে বল ক্রমে গো গো পোশাকে নাচতে নাকি ওর জুড়ি নেই, শোনা যায় রমনা ক্লাবে টেনিসে মেজর জেনারেলের পার্টনার। সাতারে কয়েকবার প্রাইজ পেয়েছে। গুলশানে প্রাসাদের মত বাড়ি—আর্কিটেক্ট লুই কানের ডিজাইন।

সোহানা চৌধুরীর পুরো জীবনী উদ্ধার করেছে পি. সি. আই-এর চারজন দুর্ব্ব এজেন্ট—সলিল, সোহেল, জাহেদ, নাসের। এর নাসারী কেটেছে দাক্ষিণ্য, তারপর স্বজ্ঞারল্যাণ্ডের জ্বলে। ইংল্যান্ডেও ছিল কিছুদিন। হঠাৎ মেয়ের কি হল, সোজা এসে ভতি হল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু পড়া-শুনা শেষ না করেই চাকরি নিয়ে বসেছে। বাড়ির লোকেরা বলে, খেলাল। পি. সি. আই-এজেন্টরা বলে, ঢং! বাবা পাকিস্তানের বাইশ পরিবারের একজন তো বটেই—তোমার এ ঘোড়া-রোগ কেন? আবার নাকি মিকিউরিট টেস্টে পাশ করে ছয় মাস স্পেশাল ট্রেনিং নিয়ে এসেছে।

‘রানাতা আবার বাইরে।’— বললো সলিল।

‘বাইরে পাঠালো কে?’—নাসের বললো কঠে রহস্য মিণিয়ে, ওই শালীই। নেক্সট মাসে স্না আমাকে যেতে হবে।’

‘রানার তো ফিরে আসার কথা?’

‘রেহানাকে জিজ্ঞেস কর।’

সোহেল ইন্টারকমের সুইচ অন করলো। রেহানার গলা শোন গেল। ‘ইয়েস?’—রেহানা বললো, ‘তোমার বস্ কবে ফিরবে?’

‘ট্রেনিং থেকে?’—রেহানা বললে, ‘ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে। এখন করাচী গেছে, ওখান থেকে মেজর জেনারেলের কাছে এক মাসের ছুটি চেয়েছে ফোনে এইমাত্র।’

‘কে বললো?’

‘সোহানা।’

‘আবার সেহানা!’—ফেপে উঠলো সোহেল, ছুটি গ্র্যান্টেড?’

‘না।’

রেগে সুইচ অফ করে দিল সোহেল। বললো, ‘এটাও ওই চুকরীক কাজ। একমাস হেলথ ক্লিনিকে থাকার পর অন্ততঃ একমাস বিশ্রাম দরকার। আমি ছিলাম স্না………দেখিস. রানা রিজাইন দিয়ে বসকে এবার।’

রানা মারীর নারী-বিবজিত হেলথ ক্লিনিক থেকে একমাস পর বের হয়ে সেজা করাচীতে এসে হাজির হয়। হোটেল ইন্টারকমে উঠে প্রথমেই ফোন করে খাই এয়ারের ফিরা রাওকে।

মেয়েটির সঙ্গে আলাপ দু’মাস আগে করাচীতেই। স্পোর্টিং টাইপের মেয়ে। আজ রাতে ওকে নিয়ে সারা করাচী ঘুরে বেড়াবে, দেখবে রাতের নগরী। একমাসের বন্দী জীবন থেকে মুক্তি সেলিব্রেশনের

চেয়ে ভাল পথ রানা খুঁজে পায় নি।

পরদিন সকালে রানা ডায়ের করলো ঢাকার—রাহাত খানের নামে।

‘হ্যালো,’ ?—সোহানার কণ্ঠ, পাকিস্তান ট্রেডাস’।’

‘মাসুদ রানা,’—রানা স্থির কণ্ঠে বললো, ‘ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে দিন।’

‘মাসুদ রানা!’—ওপাশের কণ্ঠে বিস্ময় শোনা গেল, ‘দেখুন তো, আপনার আজকে অফিসে রিপোর্ট’ করার কথা...।’

‘আই ওয়াট ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহাত খান।’—মেয়েটাকে থামিয়ে দিয়ে রানা উচ্চারণ করলো নামটা। নীরবতা।

রানা হাত বাড়িয়ে পাশে বসে থাকা ফিয়ার পিঠে হাত রাখলো। মুখটার রঙ করতিল মেয়েটা, হাসলে।। চুলগুলো ঢেকে দিয়েছে একটা চোখ, সরিয়ে দিল চুল মাথা ঝাঁকিয়ে।

‘হ্যালো?’—রাহাত খানের জলদগম্বীর কণ্ঠ।

‘রানা বলছি।’

উত্তর শোনা গেল না।

‘স্মার’ আমি এক মাসের ছুটি চাই। হেলথ ক্লিনিকে থেকে বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছি স্মার...।’

রানার বাঁ হাতটা ফিয়ার দু’হাতে ধরে বুকে টেনে নিয়ে গাল ঘষতে লাগলো।

‘তোমাকে আজকে অফিসে রিপোর্ট’ করার কথা!’—মেজর জেনারেল রাহাত খান প্রতিটি কথা’র উপর জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন বাক্যটি। একটু নীরব থেকে বললেন ‘তোমাকে এক দিনের ছুটি দিলাম, কাল অফিসে রিপোর্ট করবে। এখনই সিট বুক কর!’

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শোনা গেল। রানা এক সেকেণ্ড চুপ

করে থেকে রিসিভার কাডলে আছড়ে রাখলো। বললো ‘খুন করবো!’

‘কাকে?’—ফিয়ার কালো ভেজা ভেজা চোখে কোঁতুহল। তামাটে শরীর। রোদে-ভরা দেশের রোদে পোড়া মেয়ে। মশণ বুক, অদ্ভুত মশণ ও চকচকে। সারা গায়ে চবির লেশ নেই। আছে অশ্বিনীর ক্ষিপ্ততা। চোখে মায়া। আর আছে সুল্লর নিল’জ্জতা।

রানা গোথ ফিরিয়ে নিল। বললো, ‘খুন করবো মেয়েটাকে।’

‘কোন মেয়ে?’

‘আমার সময় কম। ষাই এয়ারে আজকে বিকেলের ফ্লাইটে কোনো সিট পাওয়া যাবে?’—রানা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ‘আজকে আর হক্স বে’ যাওয়া হল না।’

পরদিন সকাল দশটা। রানাকে দেখা গেল মতিঝিল পি-সি, আই-এর হেডকোয়ার্টারের কন্ডোরে। রানার ক্রমের দরজায় রেহানা দাঁড়িয়ে। রানাকে বেশ লাগছে ছাইয়ে টপিক্যাল স্টে। দীর্ঘ একহারা চেহারা, ব্যাক রাখ করা চুল। পরিচিত ভঙ্গীতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল।

‘হ্যালো বস।’—নাসরীন রেহানা হাসিমুখে বললো, ‘তোমাকে ওয়েলকাম করতে তোমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।’

রানা ঘরে প্রবেশ করে চারজনকে দেখলো। কারো মুখে কথা নাই, এক মনে সবাই সিগারেট টানছে।

রানা বুঝলো, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। নইলে নাসের কথা না বলে এত চূপচাপ বসে! রানা ‘হ্যালো এভরিবডি’ বলে নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসে পড়লো। তবু কেউ কোন কথা বললো না। নাসরীন রেহানার দিকে তাকিয়ে দেখলো, মুখে শুধু হাসি।

‘বস, কফি ?’—নাসরীন রেহ না বললো ।

‘কফি পরে হলেও চলবে ।’—নড়ে-চড়ে বসে সোহেল, ‘জরুরী কথা’ আছে ।’

রানার চোখের দৃষ্টিটা প্রস্রবোধক হয়ে উঠলো ।

‘তোমার জন্ত এ্যাসাইনমেন্ট রেডী ’

‘এ্যাসাইন...!’

‘ইলোপমেন্ট ।’

‘ইলোপ...!’

‘হ্যাঁ ।’—জাহেদ বললো, ‘তিনদিনের মধ্যে ।’

‘কাকে ?’

‘সোহা...ওই শালীকে, নবাব পুতীকে !’—মঃগর করে উঠলো সোহেল ।

‘না স্না, একেবারে ফিনিশ করে দে — ।’

রানা হাসতে গিয়ে গত কালকের কথা, গত একমাসের কথা মনে করেই ফেপে উঠলো । বললে, ‘আমার জন্তে অপেক্ষা করছিলি কেন ?’ তোরা এ্যান্ডিন কি ঘাস কাটছিলি ?’

‘মানে তুই’

‘হ্যাঁ, ওই পাজী মেয়েটাই আমাকে মারীতে পাঠিয়েছে । সেখানে আমাকে ‘ডু ইট ইয়োরসেলফ’ শিখিয়েছে । কি করে শাটের রোতাম লাগাতে হয়, পানি গরম করতে হয়, ডিম ভাজতে হয়... ঘোড়ার ডিম !’—রানা বললে, ‘মামি রিজাইন দেবো !’

‘না ’—সলিল বললো, পি. সি. আই-তে আমাদের হক আছে । বুড়োর ভীমরতি ধরতে পারে, আমাদের ধরে নি !’

‘আমরা স্ট্রাইকে বাবো !’—বললো জাহেদ ।

‘তার চে’ স্না ঘেরাও কর ।’—নাসের বললো ।

‘না, ওই বিচ্ছিন্ন মেয়েটাকে শাস্তেত্তা করা দরকার ।’ —রানা বললো,
‘ওই মেয়েটার মাথায় যত শস্ততানী বুদ্ধি... ।’—কথা শেষ করতে পারলো
না । ইটরকমে সিগন্যাল ।

‘মিটার মাসুদ ।’—সবাই চমকে উঠলো । ইটরকমে নারীকণ্ঠ ।
সোহানা ।

সবাই চুপ ।

‘মাসুদ রানা বলছি ।’

‘জেনারেল আপনাকে দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে দেখ’ করতে বলেছেন ।
‘রিপিট... ওয়ান জিরো থ্রি, ফাইভ...’

‘আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ’—রানা স্মিচ অফ করে দিল ।
ঘড়ি দেখলো রানা, এখন দশটা উনত্রিশ ।

নাসরীন রেহানা ঘড়ি দেখলো । বললো, ‘ওয়ান জিরো টু
নাইন... ।’

রানা গুর দিকে কটমট করে তাকালো । ত্রিশ সেকেন্ড নীরবতার
পর রানা বললো, জেনারেল আগে কোন দিন ঐ ছুঁড়ীকে দিয়ে আমাকে
ডাকেন নি ।’

‘ওই সুলতানী বুড়োর মাথা চিবিরে খেয়েছে ।’

টিক চৌত্রিশের মাথায় উঠে দাঁড়ালো রানা । বললো, ‘আজকেই
কিছু একটা দফারফা করে ছাড়বো ।’ দরজার দিকে এগিয়ে গেল ।

‘ওড মনিং মিটার মাসুদ,’—চোখ তুলে তাকালো সোহানা । বললো,
‘জেনারেল আপনার জন্তে অপেক্ষা করছেন ।’

‘এখনো ত্রিশ সেকেন্ড সময় হাতে আছে ।’ রানা বললো, ‘আজ
সন্ধ্যায় কি করছেন ?’

‘আজ!’—সোহানা অবাক হয়ে রানার মুখের দিকে তাকালো। বড় বড় দু’টো চোখ। ডিম্বাকৃতি মুখ। সিংহলি বটকের শাড়ী। একই কাপড়ে স্লিফলেস ব্লাউস। ঠোঁটে গোলাপী লিপস্টিক ভারী করে বুলানো, কপালে গোলাপী টিপ। আজ চুলগুলো খোপা করা। কাঁধ পর্যন্ত চুলে এত বড় খোপা হয়? রানা দেখলো মেয়েটির মুখে খুঁ হাসি ফুটে উঠলো, সেই হাসিতে ছড়িয়ে পড়লো রক্ত। মেয়েটির কান দু’টো লাল হয়ে গেছে। না, লজ্জাও পেতে জানে। সব দিকে চোঁকস। মাথা নিচু করলো। দ্রুত বললো, ‘আজ...আজ আমি বেশ ব্যস্ত থাকবো সন্ধ্যায়।’

‘কাল বা পরশু...’—রানা হাসলো না, তার নিষ্ঠুর চোখ দু’টো স্থির হয়ে রইলো মেয়েটির উপর। সোহানা আরো একবার রানার দিকে তাকিয়ে ইন্টারকমের স্মিচ অন করে বললো, ‘স্মার, মাহুদ রানা।’

‘পাঠিয়ে দাও।’

সোহানা স্মিচ অফ না করেই রানার দিকে তাকালো। কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেল রানা ইন্টারকমের স্মিচের দিকে তাকিয়ে। সোহানার ঠোঁটে হাসি।

মেজর জেনারেলের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো রানা।

টাকিস টোবাকোর গন্ধে ভরে আছে ঘরটা। চার মাস একুশ দিন পর ঘরটাতে এমেছে রানা। কিন্তু বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। না ঘরের, না ঘরের মালিকের। একটু পরিবর্তন হয়েছে মাত্র ঘরের কোণে। একটা ভাসে রয়েছে কতকগুলো রজনীগন্ধা। রানার মনটা আবার খিঁচড়ে গেল। মনে মনে কয়েকটা গাল উচ্চারণ করলো। তাকিয়ে রইলো স্বপ্নের দিকে। একটা কথাও বলেন নি তিনি। বাঁকানো পাইপটা

কামড়ে ধরেছেন, গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা ফাইল দেখছেন ও পাইপটা নামিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন, টেবিলের আরেকটা ফাইল একটু ঠেলে দিলেন সামনে।

অর্থাৎ রানাকে দেখতে হবে। রানা উঠে দাঁড়িয়ে ফাইলটা ঘরের সঙ্গে নিয়ে আবার বসলো। লাল ফিতে খুলে রানা দেখলো বিশেষ কিছু নেই—একটা কাগজের উপর পেস্ট করা খবরের কাগজের একটা টুকরো। কোণায় লেখা তারিখ, ‘নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড’। তারপরেও কতকগুলো কাটিং রয়েছে, প্রত্যেকটা কাটিং-এর শীর্ষে তারিখ এবং কাগজের নাম লেখা। একবার কাগজের নামগুলোর চোখ বুলিয়ে ভাল করে দেখলো, কর্মখালির বিজ্ঞাপন মনে হচ্ছে। সর্বনাশ! রিজাইন দেবার কথা শুনলো কোথেকে এই বুড়ো? বুড়ো এক মনে ফাইলটা দেখছেন।

রানা পড়ে ফেললো প্রথম বিজ্ঞাপনটা। কেমিক্যাল, টেকনিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের বিজ্ঞাপন! হাঁফ ছেড়ে বাঁচে রানা। তার জন্মে না। ‘মহা বাঁচা বেঁচে গেলাম ভাব নিয়ে রানা মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটা বিজ্ঞাপন পড়ে গেল। লোক চাই। মাইক্রো মিনিয়চারাইজেশন, হাইপার নোনিকস্, এ্যারো ডাইনামিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স, রাডার, এ্যাডভান্সড ফুয়েল টেকনোলজি, ফিজিক্স—ইত্যাদি ব্যাপারে লোক চাই। বেতনের ঝেল দেখে ভুরু কুঁচকে গেল রানার। অবিশ্বাস। গগনচুম্বী বেতন। বিজ্ঞাপনগুলো বের হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাষায়। ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানীশ থেকে রানা বুঝতে পারলো, বিজ্ঞাপনগুলোর বিষয়বস্তু মোটামুটি এক, কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়েছে ফার-স্টেটের বিভিন্ন দেশের কয়েকটি ফার্ম। রহস্যজনক বিজ্ঞাপন। কিন্তু এর সঙ্গে কি, সি, আই, বা পাকিস্তানের কি সম্পর্ক? অবশিষ্ট পাকিস্তান টাইমস্-এরও একটা কাটিং আছে।

রানা আবার পড়লো বিজ্ঞাপনগুলো। জেনারেল তাকে ভালো করে পড়ার সুযোগ দিচ্ছেন। তার মানে, এ সম্পর্কে আলোচনা করবেন তিনি।

‘কি বুঝলে?’—অনেকক্ষণ পর স্বন্ধের কঠিন শূন্যে শেয়ে রানা চোখ তুলে তাকালো স্বন্ধের মুখে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে কাঁচা পাকা ভুরু দু’টো সংবেগিত করছেন। তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। মুখের অঙ্গশ্রবণ বহিঃস্থার মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, এইমাত্র একটা প্রশ্ন করেছেন তিনি। অথচ কোটেরে বন্দী চোখে প্রশ্নটা লেগে রয়েছে। রানা এই কঠোর স্বন্ধের উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ আগেই বিষোদগার করেছে। করাচী থেকে ফেরার পথে হাজারবার মুণ্ডপাত করেছে। অথচ এর সামনে এলেই কেমন যেন অসহায় হয়ে যেতে হয়।

রানার উত্তর দিতে দরী দেখে স্বন্ধের বাঁ ভুরুটা একটু উপরে উঠলো।

‘মনে হচ্ছে, অনেকগুলো দেশ এবং ফার্মের নামে বিজ্ঞাপনগুলো করা হলেও এর পেছনে একটা যোগসূত্র আছে। একই ফার্ম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এক্সপার্ট সংগ্রহের চেষ্টা করেছে বিভিন্ন নামে।’—রানা কথাগুলো গড়গড় করে বলে থমকে গেল। দেখলো স্বন্ধের চোখে প্রশ্নটা এখনো রয়েছে গেছে। রানা আবার বিজ্ঞাপনগুলো দেখে বললে, ‘প্রচুর বেতন দিয়ে শ্রেষ্ঠ লোক সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে। সবশেষ বিজ্ঞাপনটা ছাপা হয়েছে আটমাস আগে প্যারিসের ‘লা ফিগারো’ পত্রিকায়। এদের বিজ্ঞাপনের ধরনটা অন্তত, প্রত্যেকটি চাকরিপ্রার্থীকে বিবাহিত হতে হবে এবং স্ত্রীক কাস্তে যোগদান করতে হবে, কিন্তু বাচ্চা-কচ্চা সঙ্গে নেওয়া চলবে না।’

রানা আবার তাকালো স্বন্ধের চোখে। এবং বলতে লাগলো, ‘স্যার, এরা যে ধরনের এক্সপার্ট চেয়েছে তাতে মনে হচ্ছে এদের উদ্দেশ্য অস্বাভাবিক। সব ক’জনকে একত্র করলে বিরাট কিছু একটা করা যেতে

পারে। মিসাইল তৈরী করতেও এ ধরনের এক্সপার্ট প্রয়োজন।’

‘হম্’—এতক্ষণে বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন, এতক্ষণে খেয়াল করলেন পাইপের আশ্রয় নিতে গেছে। গ্যাসলাইটারে আশ্রয় ধরালেন। একটা টান দিয়ে বললেন, ‘তুমি ঠিকই ধরেছ। এসব বৈজ্ঞানিক মিসাইল তৈরীর প্রয়োজনে লাগতে পারে। এবং এও তোমার ধারণা থাকতে পারে যে, মিসাইল যে-কেউ ইচ্ছে করলেই তৈরী করতে পারে না। ইট্‌স এ বিগ প্রোজেক্ট। হ্যাঁ, পাকিস্তানের তরফ থেকেই বিজ্ঞাপনগুলো দেওয়া হয়েছিল। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বুঝবে, কোনখানে ফার্মের ঠিকানা নেই, যোগাযোগের জন্তে পোষ্ট বক্স নাম্বার দেওয়া আছে মাত্র। পাকিস্তানই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ করে টোকিও বা হংকং-এর পথে পাঠিয়ে দেয়।’

‘টোকিও কেন?’

‘টে কিওর পথে বলেছি। হ্যাঁ, এই বৈজ্ঞানিক দলে মোট আটজন সদস্য ছিল। এবং দু’জন ছিল পাকিস্তানী। এটা আট মাস আগের ঘটনা। এ আট মাসে এদের কোন খবর পাওয়া যায় নি। আমার অনুসন্ধান মতে, এরা কেউ টোকিও বা হংকং পৌঁছয় নি।’

‘পৌঁছবার কথা ছিল কি?’

রিভলভিং চেয়ারটা কাত হয়ে গেল। এদিকে না তাকিয়েই কথাটার উত্তর দিলেন জেনারেল, ‘না, ছিল না।’—একটু থেমে বললেন, ‘কিন্তু সেটা এখানে আমাদের জানান্য কথা নয়। এটা টপ সিক্রেট ব্যাপার। হ্যাঁ, পুরো ব্যাপারটা তোমাকে জানতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে সব কিছু। তার আগে আমাদের ধরে নিতে হবে, আমরা কিছুই জানি না।’—ঘুরে বসলেন মেজর জেনারেল, ‘আজ রাত দু’টোর ক্লাইটে রওনা হচ্ছে তুমি।’

‘আজ...আমি...’

ড্রয়ার টেনে খুললেন জেনারেল। বের করলেন আর একটা কাগজ। কাগজটা ভাঁজ করাই ছিল, সেটা এগিয়ে দিলেন, ‘তুমি কেন যাচ্ছে, এটা পড়লেই বুঝতে পারবে।’

রানা কিছু না বুঝেই বিজ্ঞাপনটা পড়লো। একই বিজ্ঞাপন, এবার চেয়েছে শুধু একজন এ্যাডভান্সড সলিড ফুয়েল এঙ্গপাট’। রানা কিছু না বুঝে তাকাল প্রাচীন-মুখগীর দিকে। স্বল্প রানার জ্বাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, ‘এটা সলিড ফুয়েল এঙ্গপাটের জন্তে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন। প্রথমবার এই পোষ্টের জন্তে গিয়েছিলেন পাকিস্তান থেকে ডঃ বরকত উল্লাহ। নিশ্চয় নাম শুনেছো। আর দ্বিতীয় পাকিস্তানী যাইলেন যিনি তাঁকে তুমি ভাল ভাবেই চেন, সেলিম খান। নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট ডঃ সেলিম খান। গ্রীনগর থেকে তুমিই তাঁকে উদ্ধার করে পাকিস্তানে নিয়ে এসেছিলে।’—মেজর জেনারেল ড্রয়ার থেকে কয়েকটা ফটো বের করে রানার সামনে দিলেন, ‘ফটোগুলো দেখে নাও। প্রথম ফটোটা ডঃ বরকতউল্লাহ, তার পরের জন ডঃ সেলিম খান। অন্যদের নামে তোমার প্রয়োজন নেই, চেহারাগুলো মনে রাখার চেষ্টা কর।’

ফটোগুলো দেখতে দেখতে রানা বললো, ‘এঁরা কি কারো হাতে মারি হয়েছেন বা...?’

‘কিছুই আমরা জানি না।’—মেজর জেনারেল বললেন, ‘কোথায়, কি ভাবে, কি হচ্ছে—কিছুই আমাদের জানা নেই। জানানোর প্রসঙ্গ উঠতো না...।’

‘কোনো সূত্র ছাড়া কিভাবে আমি কাজে এগবো?’

‘সলিড ফুয়েল এঙ্গপাট, আমেরিকার এন, আই, টি, থেকে এম, এস, মিউনিকের পি. এইচ. ডি., ডক্টর মাহমুদ রানা হিসেবে তুমি যাচ্ছে।’

‘স্বা—’,...রানা ভাবলো বুড়োর মাথা একেবারেই বিগড়ে গেছে।

বুড়োর জ্ঞানা উচিত, মাসুদ রানা গাড়ির পেট্রল ছাড়া আর কোন ফুয়েল সম্পর্কে পেটে বোমা মারলেও একটা কথা বলতে পারবে না। কিন্তু বুড়োর মুখে ভাবের কোন পরিবর্তন নেই। পাইপে নতুন টোবাকে ভরছেন। রানা পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে নিয়ে বললো ‘আমি এ চাকরিতে প্রথম ধাপেই আউট হয়ে যাবো, স্যার। কারণ...’

পাইপের মুখটা নেড়ে রানাকে থামিয়ে দিয়ে পাইপে আশ্বিন ধরিয়ে আরেকটা ফাইল বের করলেন বৃদ্ধ, এগিয়ে দিলেন একটা কাগজ। বললেন, ‘তোমার নিয়োগ-পত্র। ওরা তোমার যোগ্যতা সম্পর্কে কম্প্রিট্‌লি স্যাটিস্‌ফায়েড, টেলিগ্রাম মারফত কাজে যোগ দিতে বলছে। এই যে তোমাদের টিকেট।’

‘আমাদের?’

‘মিষ্টার এ্যাণ্ড মিসেস্‌ মাসুদ রানা।’—বলে এবার একটু হাসলেন যেন।

‘আমি স্যার, বিয়েই করি নি।’

‘করা উচিত ছিল। বয়স তো কম হল না?’—বৃদ্ধ সহজ কণ্ঠেই বললেন। বলেই কাঠিন্দ আনলেন কণ্ঠে, তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে যাচ্ছেন। তিনমাস আগে বিয়ে হয়েছে তোমাদের। পাকা কাগজ-পত্র আছে, বিয়ের সাক্ষী হিসেবে অনেকেও লোকেস সইও আছে।’

‘কিন্তু আমার সই?’

‘পি, সি, আই, এর ফরজারী বিভাগটা সম্পর্কে তোমার ধারণা আরে? একটু উঁচু হওয়া উচিত।’—মেজর জেনারেল উঠে দাঁড়ালেন। হাতের এনভেলপটা এগিয়ে দিলেন রানার দিকে। বললেন, ‘এতে সব পাবে। খামটা সঙ্গেই রাখবে। আর হ্যাঁ, রানা, দেন-মোহরের টাকার অঙ্কটা তোমার জেনে রাখা উচিত।’—বৃদ্ধ হাসলেন বৃদ্ধ। হেসেই মুখ ফিরিয়ে জানালায় কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘একলাখ।’

‘এ...ক...লা...খ!’—হালকা হবার সূযোগ পেয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে রানা বললো, ‘অর্ধেকটা এখনই দিতে হবে না তো?’

স্বন্ধ উত্তর দিলেন না। বোঝা যাচ্ছে, রানার অজান্তে তার একটা পাকাপোক্ত বিষয়ে দিতে পেরে মনে মনে বেশ কৌতুক বোধ করছেন স্বন্ধ। রানা ভয়ে ভয়ে বললে, ‘স্যার, দেখতে কেমন মেয়েটা? কানা খোঁড়া নয় তো?’

‘কানা-খোঁড়া!’—মেজর জেনারেল টেবিলে ফিরে এলেন। বললেন, না, ‘হ, মেয়েটি খুব ভাল। এপথে অনেকদিন থেকে লেগে আছে একটা এ্যাসাইন্মেন্টের জন্তে। কিন্তু তেমন কোন সূযোগ পায় নি। এবার স্বখন সে জানলো’, একটা মেয়ে দরকার, নিজেই সে প্রস্তাব দিল, এড়াতে পারি নি।’

‘কে স্যার? পি. সি. আই-এর এ্যাসাইন্মেন্টের খবর যে জানে এবং...’

‘ও হো!’—মেজর জেনারেল ইন্টারকমের সুইচ অন করে বললেন, ‘মিসেস মাসুদ রান’, কাম ইন, রিজ।’

রানা ঘরের দরজাগুলো দেখলো। পিছনের দরজাটা খুলে গেল। পিছন ফিরে তাকালো রান’, দেখলো দরজায় দাঁড়িয়ে সোহানা। দু’পা এগিয়ে এলো মেয়েটি, আবার থমকে দাঁড়ালো। রানা বিস্মিত চোখ মেজর জেনারেলের দিকে ফেরালো। দেখলো কৌতুকে ভরা দু’টো চোখ।

রানা বললো, ‘এ যাবে?’

‘হ্যাঁ।’ বলে সোহানার উদ্দেশ্যে বললেন, ‘আস বোস।’

উ-উহ্ বোস, এতো। আমার বেলায় যত ইশারা-ইঙ্গিত। বিয়েটাও দিল এক ইশারায়। এর বেলায় বোস। সোহানা বসতে যাচ্ছিল ওপাশের চেয়ারটিতে, বাধা দিলেন জেনারেল। রানার পাশের চেয়ারটিতে

বসতে ইঙ্গিত করলেন। নিজেও বসলেন। রানা বললো, 'স্যার, এসব বিপদ...।'

'সোহানা নিজের সম্পর্কে সচেতন।'—জেনারেল আবার পুরোনো মেজাজে ফিরে গেছেন। বললেন, 'তোমাদের আন্তর্জাতিক রাত দু'টোর প্লেনে রওয়ানা হতে হবে। ফিলিপিনো এয়ারে করাচী-কলম্বো-ব্যাঙ্কক-ম্যানিলা-টোকিও তোমাদের রুট। এই রুটেই ডঃ বরকতউল্লাহ গিয়েছিলেন। শুধু বরকতউল্লাহ নয়, আগের আটজন বিভিন্ন রুটে গেলেও ম্যানিলা সবার কমন-স্টপেজ ছিল। অর্থাৎ ম্যানিলা থেকেই তোমার কাজ শুরু। এবার বল, পুরো ঘটনাটো তুমি কি ভাবে নিলে?'

রানা পাশে বসা সোহানাকে দেখলো। ও বেচাদী এদিকে তাকাতে গেলে দু'জনের চোখা-চোখি হয়ে গেল। সোহানা ভক্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'স্যার, ক'ফি?'

'নিশ্চয়ই।'

সোহানা পাশের ঘরে চলে গেল।

রানা মনে মনে শুধিয়ে নিয়ে বললো, 'আমি বুঝলাম, কোনো একটা বন্ধু রাষ্ট্রকে আমরা সাহায্য করছিলাম কিছু 'কন্সপার্ট' ঘোষণা করে দিয়ে। গোপনে সাহায্য করতে গিয়ে কিছু চাতুর্যের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। এখন বন্ধু রাষ্ট্রটি কিছু একটা আমাদের কাছে লুকোতে চাইছে বা এড়াতে চাইছে। দু'রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা নষ্ট হতে পারে সে ক্ষেত্রে অফিশিয়ালি কিছু বলা যাচ্ছে না, অথচ আমাদের জানা দরকার, আমরা সত্যি সত্যি কোনরকম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি কিনা। তাই আমাদের এই মিশন।'

'অনেকটা ঠিকই ধরেছো।'—সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন বন্ধু। বললেন, 'তবে আরো একটা সল্যেহ তোমার মনে থাকা উচিত—তৃতীয় কোন শক্তি এর পেছনে কাজ করতে পারে। আরেকটি ব্যাপার ঠিকই ধরেছিলে,

যে সব এক্সপার্ট ওখানে নেওড়া হয়েছে তাদের দিয়ে শক্তিশালী কোনো মারগাঙ্গ তৈরী করা সম্ভব।’

সোহানা দু’জনার সামনে দু’কাপ কফি রাখল এবং নিজের কাপটি নিয়ে এসে আগের চেয়ারটিতে বসলো। কফিতে চুমুক দিয়ে মেজর জেনারেল বললেন, ‘এটুকুই তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে আশা করি। দু’জন এক সঙ্গে থাকবে, পরস্পরকে সাহায্য করবে। আর...।’
—একটু অনামনস্থ হয়ে গেলেন বৃদ্ধ।

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ালো রানা। সঙ্গে সঙ্গে সোহানাও উঠলো।

বৃদ্ধ দু’জনকে দেখলেন। একজন কঠিন কঠোর দৃঢ় পুরুষ মূর্তি। অন্যজন...সোহানাকে দেখতে দেখতে ভাবলেন, ভুল হল না তো? এ মেয়ে পারবে কষ্ট সহ্য করতে? না, আজ পর্যন্ত তিনি ভুল ডিসিশন নেন নি। এবারও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

‘যাও বেরিয়ে পড় তোমরা।’—বৃদ্ধ বললেন, ‘উইশ ইওর বেস্ট অব লাক।’—সাঁ করে ঘুরে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালেন। ওরা দু’জন দেখছিল, আলোর পটভূমিতে ঋজু শরীরটা, দীর্ঘ দেহ, একটু বেঁকে গেছে—ধনুকের বক্রতা।

ওরা দু’জন ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ঘর থেকে বের হয়ে এসেই দু’জন মহা বিপদে পড়লো। সোহানা নিজের চেয়ারে বসে ড্রয়ার খুলে ক্যাননিক কিছু খুঁজতে লাগলো। ভাবলেন, রানা বেরিয়ে যাক আগে।

রানা একে দেখছিল দাঁড়িয়ে পড়ে।

সোহানা রানার দিকে না তাকিয়েও তার দৃষ্টিটাকে অনুভব করছিল। রানাকে কথা বলতে না শুনে তাকালো কুমীরের চামড়ার হাড় আকারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে। বললো ‘মার্সীর হেল্প

সেণ্টারে থেকে আপনার শরীরটার বেশ উন্নতি হয়েছে।’

রানার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হলো। তাতে উহলে পড়লো একটা কৌতুক। বললো, ‘হেল্‌থ সেণ্টারে পাঠিয়েও বুড়ো ক্ষান্ত হন নি, এখন হেল্‌থ ইনস্পেক্টর নিয়োগ করলেন।’—রানার কণ্ঠ যেন কিপু হসে উঠলো। বললো, ‘এ সবে মরণদাত্রীটা কি আপনিই?’

‘আ—আমি!’—সোহানা ডান হাতটা বুকে রাখলো বিস্ময়ের সঙ্গে।

‘বুড়োর আর ক’টা আদরের বস্তু কষ্ট আছে?’—রানা বললে, ‘আদরের ঠেলায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দায়মুক্ত হলেন।’

‘কিসের দায়?’—সোহানার কান আরো লাল হয়ে ওঠে লজ্জায় এবং রাগে।

‘বুড়োর কি বুদ্ধি! চালাকী করে মেডিক্যাল চেক আপের নামে দিব্যি কাপড় আয়রন কর’, আমার বোতাম লাগানো শিখিয়ে দিচ্ছেন।’—রানা বললো, ‘দেখুন ওহলো আমি কোনদিন কংতে পারবো না বলে দিচ্ছি।’

‘আপনি করবেন না তবে কে করবে?’—আবার বুকের উপর হাত রাখলো, ‘আমি?’

‘আজ্ঞে হাঁ!’—রানা হাসলো, ‘মিসেস্‌ মাসুদ রানা।’

‘মাই ফুট, মিসেস্‌।’

‘বেশি রাগবেন না’, মিসেস্‌ রানা। কাজের কথা বলছি, শুনুন। আজ থেকে, আমার কথামত চলতে হবে।’

‘মিশন শেষ হওয়া পর্বন্ত।’—সোহানা শূন্য করে দিল। মিশন শেষ হবে, বলা যায় না।—রানা বললো, ঠিক দশটায় আপনাকে আমার বাড়িতে দেখতে চাই। বিদায়ের কাজটা বাড়িতে সেরে আসবেন। আর একটা কথা, কবিতার বই সঙ্গে নিবেন।

‘কবিতার বই!’

‘অবকোস’ । এটাকে সত্যিকারের হানিমুন মনে না করাটাই উচিত ।’

রানা সুইংডোর ঠেলে পেন দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়েই এবারিয়ে গেল ।

সোহানা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ।

রানা নিজের ক্রমে গিন্না দেখল, ওরা চারজন ঠাণ্ড বসে আছে ।
এদের কথা ভুলে গিয়েছিল ও ।

‘কি হল, কি করবি ?’—চারজনের ব্যগ্র প্রশ্ন ।

‘অপারেশন সাকসেস্‌ফুল । আজ রাত দু’টোয় এয়ার পোর্টে’
উপস্থিত থাকবি । ওকে ইলোপ করছি ।’

‘ইলোপ !’

রানা কোন কথা না বলে সিনিয়র সার্ভিস ধরালো ।

রাত দেড়টায় একটা ট্যাক্সি থেকে রানা নামলো । নেমেই দেখলো চারটা মূর্তি এবং রেহানা দাঁড়িয়ে । রানা হাত বাড়িয়ে দিল গাড়ির ভেতরে । সোহানা হাত ধরে নামলো । গভীর নীল রঙের ফ্রেক জর্জেটের শাড়ী । চওড়া হলদে পাড় । হলদে ব্লাউজ । খোঁপা করা চুল । হাতে সোনার বালা, কপালে নীল রঙের টিপ । চারজনের আটটা বিন্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো সোহানা । রেহানার দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেল । রানার পরনে নীল রঙের স্কাট, হালকা নীল শার্ট, লাল টাই । সোনার টাই পিন যেন সোহানার হলদে পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করে পরা । পোর্টার মাল পত্র নিয়ে চলে গেল । রানা ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে চারজনের দিকে তাকালো । বাঁ হাতটা রাখলো সোহানার পিঠের উপর দিয়ে বাঁ কাঁধে । সোহানা

রানার দিকে তাকিয়ে দেখলো, কিছু বললো না। রানা ওদের দিকে এগিয়ে গেল। গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললো, তাড়াহড়ো মধ্যে তোদেরকে জানাতে পারিনি...তোদের সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দি, মিসেস্ মাহুদ রানা।—সোহানার দিকে তাকিয়ে বললো, ‘ওদের তো ভূমি চেনো ডার্লিং।’

সোহানা রেগে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, ‘আমাদের দেবী হয়ে গেছে।’—বলে গটগট করে এগিয়ে গেল।

‘কি ব্যাপার?’—ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো সোহেল।

‘ঝামেলা, ঝামেলা!’—রানা এগিয়ে যেতে যেতে বললো, ‘তোরা বুঝি না, বিয়ে তো আর করিস নি।’

পাঁচজন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

‘ওদের মানিয়েছে কিন্তু।’—রেহানা বললো, ‘তোমাদের উচিত রানার বিয়েটা সেলিব্রেট করা। বুড়োটাকে একা পাবে এবার তোমরা।’

কিন্তু কে শোনে এখন রেহানার কথা।

গ্লেন ছেড়ে দিলে ওরা ওপরের রেস্টোরাঁ থেকে নেমে এল। পাকিং লটে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

রেহানা ফিসফিস করে বললো, ‘মেজর জেনারেল রাহাত খান।’

পাঁচজনই দেখলো শীর্ণ ছায়ামূর্তি। কিন্তু একা নয়।

ছায়ামূর্তি দু’টো। একটা কালো ডজ-এ গিয়ে উঠলো।

ওদের কাছে পুরো ব্যাপারটা আরো বোঝালো হয়ে গেল।

‘কি ভাবছো?’—মেজর জেনারেল রাহাত খান জিজ্ঞেস করলেন পাশে বসা সাদুলাহ চৌধুরীকে। গাড়িটা আন্তে আন্তে গুলশানে

দিকে এগুচ্ছে। একটু থেমে কোন উত্তর না পেয়ে বললেন, 'মেয়ের কথা ভাবছো? ভাবছো, কেন ঠেলে দিলাম এই বিপদের মূখে?'

'না জেনারেল, ওসব ভাবছি না। ওর মা মারা যাবার পর থেকে মেয়ে আমার কাছ-ছাড়া। দেশ-বিদেশ ঘুরে একেবারে বখাটে হয়ে গিয়েছিল। তুমিই ওকে মানুষ করে তুললে। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম হঠাৎ এভাবে শাস্ত হয়ে উঠতে দেখে।' —চৌধুরী বললেন, 'তুমি যা করবে নিশ্চয়ই তাতে খারাপ কিছু হবে না।'

রাহাত খানের তরফ থেকে কোন উত্তর এলো না। কি যে ভাবছেন তিনি। হঠাৎ বললেন, 'জানো চৌধুরী, ওরা সবাই আমাকে বিশ্বাস করে তোমার মতোই। তুমি যেমন জানতে চাও নি, ওরা কোথায় গেল, ওরাও 'তেমনি জানতে চায় না, কি হবে' এসব করে। ওরা আমাকে বিশ্বাস করেই জীবন দেয়।'

'তখন ওরা ভাবে, দেশের জন্তেই মরলাম।'

'কিন্তু দেশ এদের কি দেয়?'—অন্ধকারে জেনারেলের কণ্ঠ কঁপে গেল, 'নেতা মরলে আমরা স্বতীসৌধ তৈরী করি, বিদেশে কোন সৈনিক মরলে তার স্বতদেহ দেশের পতাকায় ঢেকে এনে ফেয়ারওয়েল স্যালুট করি, সৈনিকের বীরত্ব নিয়ে কত গাথা রচিত হয়। কিন্তু একজন স্পাই মারা গেলে তাকে দেশের নাগরিক বলে অস্বীকার করি। করতে হয়। তবু এরা একটা বিশ্বাস নিয়ে দেশের কাজে এগিয়ে যায়। হ্যাঁ চৌধুরী তোমার মেয়েও এমনি এক বিশ্বাস নিয়ে একটা বিশেষ মিশনে গেল। ইচ্ছে করেই পাঠালাম। ওর অনেক সখ বড় একটা কিছু করার। না করতে পারলে হয়তো আবার আগের মত বখাটে হয়ে উঠতো। পোষ মানাবার জন্তেই ওকে পাঠালাম। ভয় হচ্ছে এবার?'

'ভয়?'—হাসলেন চৌধুরী, হয়তো হচ্ছে। কিন্তু আমি ভাবছি

‘ওদের দু’জনকে মানাচ্ছিগ বেশ ।’

‘হ্যাঁ ।’—মেজর জেনারেল বললেন, জানো চৌধুরী, আমার এই প্রথম
নিজের উপর অবিশ্বাস এসে যাচ্ছে । ভাবছি, ভুল করলাম না তো ?’

দু’জন আর কোন কথা বলতে পারলো না ।

ম্যানিলায় রাত দশটার ল্যাও করলো ফিলিপিনো এয়ারের DC-৮ বিমানট। আগামীকাল সকালে টোকিও যাবে। এ লাইনে টোকিওর যাত্রী-সংখ্যা একেবারে নগণ্য। কেননা, নন-হর্টেজ অন্যান্য এয়ার লাইন থাকতে এখানে কেউ ওঠে না যদি বিশেষ প্রয়োজন না থাকে।

ম্যানিলা হোটেলে নিজে চললো যাত্রীদের এয়ার ওয়েজের নিজস্ব বাস।

বাসে যাত্রীরা অন্ধকারে ম্যানিলা শহর দেখতে ব্যস্ত। সোহান অস্তে করে বললো, ‘রাত না হলে বেশ হত।’

‘হ্যাঁ’, ম্যানিলা বে-র সূর্যাস্ত দেখা যেত।—রানা বললো, ‘অপূর্ব।’

‘আমি সূর্যাস্তের কথা ভাবছি না।’

‘ওবে কি ইন্ট্রামুরোস দেখার কথা ভাবা হচ্ছে?’

‘কি?’

ইন্ট্রামুরোস, ওয়াল্ড্, সিটি।—রানা বললো, ‘তখন ম্যানিলা স্পেনিয়ার্ডদের হাতে ছিল তখনকার শহর। ম্যানিলা হোটেলের এক-দিকে ম্যানিলা-বে, অত্রদিকে প্রাচীন শহর...’

‘ও-সবে আমার আগ্রহ নেই।’

রানা এবার আর কিছু বললো না। ভাবলো : মেয়েটা এ্যাডভেঞ্চারের

জন্মে শূক্ৰিণে আছে । অথচ ভয় পেয়েছে । বারবার ঢোক গিলে
গলা ভিজাচ্ছে ।

ম্যানিলা হোটেলে সমুদ্রের দিকে তিন-তালায় ওনের স্ন্যুট । রুমের
ডুকেই রানা বললো, ‘তাড়াতাড়ি পোষাক বদলে নিতে হবে ।’

‘আমি গোসল করবো ।’—ঘাষণা করলো সোহানা ।

‘সময় কম ।’

‘সারারাতটাই তো রয়েছে ।’

‘কিন্তু গোসল করার জন্মে নেই ।’—একটু ভেবে রানা দম্মা দেখিয়ে
বললো, ‘ঠিক আছে । তবে বাথরুমের শাওয়ারের নিচ থেকে কিডন্যাপ
করলে নিজেকেই কেঁদে ভাসাতে হবে । কেননা, কেউ ককটেল ড্রেস
পরে শাওয়ারের নিচে নিশ্চয়ই দাঁড়ায় না ।’

সোহানা ওড়িৎ গতিতে একটা স্ন্যুটকেস নিয়ে বাথ-রুমে ঢুকলো ।
রানা হেসে নিজের কাপড় ছাড়তে লাগলো । এবং কাপড় বের করার
জন্মে স্ন্যুটকেস খুলে হো হো করে হাসলো । সোহানার স্ন্যুটকেস ।
রানার স্ন্যুটকেস সোহানা নিয়ে গেছে ভেতরে । ভাবলো, দরজা নক
করে স্ন্যুটকেসটা বদল করে নেওয়া দরকার । কিন্তু ভেতরে ওখন
শাওয়ারের শব্দ শোনা যাচ্ছে । নফল বট-এর সঙ্গে এক ঘরে থাকার
বিপদটা বুঝতে পারছে ও ।

রানা বিছানায় বসলো শর্ট’স্ পরেই । রিসিভার তুলে ডায়াল
করলো রুম-সার্ভিসে । ডিনার এখানেই সার্ভ করতে বললো । শেষে
অর্ডার দিল ব্রাক-ডগ হাইক্লির ।

শাওয়ার বন্ধ হয়েছে । রানা কান পেতে রইলো । হ্যাঁ, বন্ধ
দরজার ওপাশ থেকে সোহানার ক্ষষ্ঠ শোনা যাচ্ছে । ‘মেজর রানা,

মেজর...।’

‘মেজর রানা বললে জবাব পাবে না ।’

‘এখানে কেউ নেই, সবার সামনে তো নাম ধরেই ডাকবে বলেছি ।’

‘সবার সামনে জবাব পাবে ।’

একটু নীরবতার পর শোনা গেল, ‘রানা, আমি ভুল করে আপনার স্ম্যটকেসটা---- ।’

‘তোমার স্ম্যটকেস ।’

‘হ্যা, তোমার স্ম্যটকেসটা নিয়ে এসেছি ।’

‘ঠিক আছে, বদলে নাও ।’—গভীর গলায় বললো রানা ।

‘আমি বেরুতে পারবো না, তুমি একটু দিয়ে যাবে ওটা ?’

‘দিতে পারি যদি খাবার পর পাশের লুনেটাতে যেতে রাজী হও ।’

‘আমি রাজী আছি ।’—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল সোহানা ।

রানা হেসে স্ম্যটকেসটা নিয়ে বাথ রুমের সামনে দাঁড়ালো ।

নক করে বললো, ‘জানতে চাইলে না, লুনেটা কি ?’

‘আপনার....তোমার সাথে একসঙ্গে থাকার চেয়ে খারাপ কিছু নিশ্চয়ই নয় ।’—সোহানা উত্তর দিল, ‘তোমাকে আগেই বলা উচিত ছিল, ম্যানিয়ার আমি আগেও দু’মাস থেকে গেছি ।’—দরজার হুক খুললো, একটু ফাঁক হল । বেরিয়ে এল একটা স্ম্যটকেস । রানা ভেজা ছাতটাতে অন্য স্ম্যটকেসটা ধরিয়ে দিয়ে হুকুম দিল, শাড়ী না, স্ন্যাকস্—পারবে ।’

দরজা সশব্দে বন্ধ হল ?

সোহানা যখন বেরিয়ে এলো তখন ওর অস্ত্র চেহারা । গোল্ডেন-কর্ডের বেল-বটম, হলদে শার্ট, কোমরে চওড়া কালো বেষ্ট । চুল বেছে দেওয়া । ঠোঁটে অরেঞ্জ লিপস্টিক । রানাও পরলো ফিলিপিনো

জালা ছাপের শাটের সঙ্গে ঝয়েরী কর্ডের জ্যাকেট ও প্যাণ্ট ।

ডিনার খেতে খেতে রানা ব্র্যাক ডগ থেকে পেগ তিনেক পান করলে, সোহানা পান করবে না বললো । অভ্যাস নেই । জিস্টেস করলে, 'লুনেটা যাবেন, বলেছিলেন । যাবেন ?'

'বেশি রাত হয়ে গেছে ।'

'লুনেটা গাড়ে'নে বসে সমুদ্রে সূর্যাস্ত কোনদিন দেখেছেন ?'

'না ।'—রানা বললো, 'অনেক শুনছি । কিন্তু ভাল কিছু দেখার সুযোগ আমার হয়ে ওঠে না ।'

'জানেন ? মেজর...'

'জানে, রানা !'—সংশোধন করলো রানা ।

এত বড় একটা লোককে নাম ধরে ডাকতে পারবো না । —লক্ষ্য লক্ষ্য ভাব করে বললো সোহানা ।

'তোমার হাসব্যাককেও তুমি মেজর বলে ডাকবে ?'

'কিছু বলব নিশ্চয়, কিন্তু সেটা হাসব্যাককে, আপনাকে নয় ।'

'বন্ধুকে নাম ধরে ডাকে না মানুষ ?'—রানা হঠাৎ সহজ ভাবেই বললো কথাটা ।

'ডাকে । আপনি তো বন্ধুও নন ।'

'তবে কি ?'

'কলিগ ।'—একটু ভেবে বললো সোহানা ।

'হ্যাঁ, তোমাকে সেই হিসেবে চলতে হবে । এখানে আমার কথামত চলতে হবে । অফিস থেকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : তোমাকে আমার জীর ভূমিকায় ঠিক ঠিক অভিনয় করতে হবে ।'—কথাটা বলতে বলতে রানা উফ হয়ে উঠলো, গ্রাসে হইস্টি ঢেলে চুমুক দিল । আবার মুখ না তুলেই বলে 'চললে', অফিসে কি মেকের অভাব ছিল ? কেন তুমি এলে ? যা পারবে না তা করতে এলে কেন ?'

‘এসেছি অফিসের নির্দেশে। অফিসের নির্দেশ, লোকের সামনে আমাকে অভিনয় করতে হবে—তার বেশী কিছু নয়।’—সোহানাও ক্ষেপে উঠলো, ‘হ্যাঁ, শুধু অভিনয়, এবং লোক দেখানো অভিনয়। এ ছাড়া আমাদের সম্পর্ক দু’জন কলিগেরই।’

সোহানা গিয়ে দরজা খুলে ব্যালকনিতে দাঁড়ালো।

‘মিস্ কলিগ!’—রানা ডাকলো।

সোহানা ঘরে এসে দাঁড়ালো। ওর চোখের কোণ ভেজ ভেজ।

‘কবিতা ত খুব পড়েন।’ ‘চার্চ ফর স্ট্র লাইট ব্রিগেড’ পড়েছেন?’

‘মানে পড়েছি।’—অবাক হল সোহানার কণ্ঠ।

‘লিডারকে কিভাবে মানতে হয়, দেখেছেন?’

‘দেখেছি।’

‘এ মিশনে লিডার কে?’

‘আপনি।’

‘গো টু দ্য বেড।’—রানার গলায় কঠিন আদেশ ধ্বনিত হল। সোহানা শুকে মাতালের প্রলাপ মনে করতে পারলো না। সোহানা নাইট গার্ডেন বের করার জন্তে জুটকেসে হাত দিলে রানা বললো, ‘এ পোষাকেই ঘুমতে হবে।’—সোহানা দু’সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে বিছানার কাছের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শূয়ে পড়লো।

কতক্ষণ কেটে যাবার পর দেখলো, তার ঘুম ভাঙছে না। কোণের টেবিলে রানা এখনে একভাবে বসে। হ্যাঁ, বসে আছে, ড্রিক করছে না। অস্বাভাবিক শূয়ে শূয়ে রানাকে দেখছিল সোহানা। নির্ধূর ধরনের তৃপ্তি আছে প্রফাইলে। গভীর হয়ে থাকলে খুনি মনে হয়। খুনি ছাড়া আর কি!—কিন্তু এত ছেলেমানুষ কেন?

চোখ লেগে এল সোহানার। গত রাত ঘুমোনে হয় নি। গত কালটা সারাদিন করাচী শহরে ঘুরে কেটে গেছে।

ঘুমিয়ে পড়লো ও ।

রানা সোহানার কথা ভাবছিল না । ভাবছিল ডক্টর মাসুদ রানার কথা । ম্যানিলায় ডক্টর রানা উধাও হবে আজ রাতেই ? ঘুমিয়ে নেওয়া উচিত, রানা ভাবলো । ওরা তার ঘুমের জন্তে অপেক্ষা করছে ? একটা ব্যাপার সম্ভার লক্ষ্য করেছে, এ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা যায় না । দরজাটা আবার দেখে বিজ্ঞানায় এসে শুমিয়ে পড়লো ও আলো নিভিয়ে দিয়ে । অন্ধকারে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ । ফ্যাকাশে হয়ে এল অন্ধকার ।

পাণের বিছানায় তাকিয়ে দেখল গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে সোহানা ।

রানাও ঘুমিয়ে পড়লো একসময় ।

ঘুম ভাঙলো শীতল একটা স্পর্শে । গলার কঠার উপর কেউ আঙুল চেপে ধরেছে প্রচণ্ড শক্তিতে । চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো, একজন তার বুকের উপর ঝুঁকে এসেছে । আর গলার চেপে ধরেছে আঙুল নয়, থারট এইট ক্যালিবারের বিশাল মাউজার । তাকে চোখ মেলেতে দেখে একটু আলগা হল পিস্তলের চাপ ।

‘বুঝতে পারছি, এটা একটা পিস্তল । ওটাকে দূরে রেখেও ভয় দেখানো চলে ।’—রানা বললো । লোকটা রানাকে ভাল করে দেখে বিছানা থেকে নেমে মাউজার দিয়ে রানার মাথা নিশানা করে রইলো ।

রানা উঠে বসে চারদিকে তাকালো । সোহানার ঘুমে ক্রমাল চেপে ধরা হয়েছিল, এখন শুধু পিস্তল কানের কাছে ধরে রাখা । রানাকে উঠে বসতে দেখে সোহানা কিছু বলতে চেষ্টা করলো । কিন্তু ঠোঁট কঁপেই থেমে গেল । বেচারী বুঝতে পারছে পৃথিবীর সবকিছু

অভিনয় নয়।

তিনজন পিস্তলধারী। সবার পরনে নীল-কাল পোষাক। সোহানার গালে আঙুলের দাগ দেখা যাচ্ছে। বোকা ষান, বেশ জোরেই মুখ চোখ ধরেছিল যাতে চোঁচাতে না পারে।

পিস্তলধারীদের সবারই মঙ্গোলীয়ান চেহারা। ওদের নীল-কাল পোষাক এবং হাতের মাউজার সব মিলিয়ে মিলিট্যান্ট ভাব আছে। রানা ভাবলো, এভাবে সহজে ধরা দেওয়া কি সন্দেহের কারণ হবে না? সোহানা একভাবে তাকিয়ে আছে। পাশে দাঁড়ানো লোকটা ওকে জোর করে বসিয়ে রেখেছে। রানার চোখের ভাষা পড়ায় চেষ্টা করছে সোহানা।

‘ওরা আমাকে....।’

‘চুপ।’—থামিয়ে দিল পাশে দাঁড়ানো পিস্তলধারী।

ঘরের কোণে দাঁড়ানো পিস্তলধারী রানার সামনে এসে দাঁড়ালো। রানা দেখলো, লোকটার মাথায় নেভীর ক্যাপ। এতক্ষণে কথা না বললেও বোকা ষান, এ-ই দলনেতা। রানা জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনারা কি চান? এসবের কারণ কি? আমার সঙ্গে সামান্য কিছু ইয়েন আছে। ট্রাভেলার্স’ চেক আছে। সেটা আপনাদের দরকারে আসবে না, রিস্কি ব্যাপার। আমার জীবন গহন। অবশি আপনারা ঈর্ষিতে পারেন যদি....।’

‘আপনারা দু’জন পোষাক পরেই ঘুমিয়ে ছিলেন কেন?’—দু’জনকে চমকে দিল প্রশ্নটা।

‘আমি ভ্রম করে ক্রান্ত ছিলাম। তাছাড়া সকালেই আমাদের গ্লেন....।’—লোকটা রানার কথায় কান দিচ্ছে বলে মনে হল না।

‘আশা করি, এখন কোন ক্রান্তি নেই?’—লোকটার ঠোঁটে হাসির রেশ দেখা গেল, কিন্তু সারা মুখে তার চিহ্ন পাওয়া যাবে না। সোহানার

দিকে তাকালো, ‘মিসেস্ মাসুদ’ আপনি আপনার স্বামীর পাশে বসে আপনার স্বামীর ক্রান্তি দূর করতে আমাদের সাহায্য করুন।’—আবার হাসলো লোকটা। রানাকে বললো, ‘আপনার গ্রীকে কিন্তু খুব দুর্বল মনে হল না। আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে ওঁকে বাগে আনতে।’

সোহানা রানার পাশে এসে বসলো। রানা ওর হাতের উপর হাত রেখে একটু চাপ দিল। তিনজনের তিনটি পিস্তল দু’জনকে নিশানা করে রাখলো।

‘আকিকো?’

‘ক্যাপ্টেন।’—দু’জনের একজন এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ালো।

‘বাইরে গিয়ে হোটেল ডেসকে ফোন করে জানাও, ডক্টর এবং মিসেস্ মাসুদ রানার নামে একটা কল আছে। ওদের বলবে, ফিলিপিনো এয়ারের প্লেন কাল সকালে সিডিউল মানতে পারবে না, আরো চার ঘণ্টা লেট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ ডক্টর রানা জরুরী কাজে টোকিও যাচ্ছেন। জাপান এয়ার লাইনের একটা প্লেনে টোকিও অভিমুখে যাচ্ছে রাত তিনটায়। তাদের এই প্লেনেই সিন্টের ব্যবস্থা করেছে ফিলোপিনো এয়ার।’

‘ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন।’—আকিকো বাইরে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলে ক্যাপ্টেন বাধা দিল, ‘শোন ছোকরা, ফোন করে দু’মিনিট অপেক্ষা করবে। তারপর ফিলিপিনো এয়ারের স্টেশন ওয়াকনটা এনে দাঁড় করাবে হোটেলের দরজায়। ডেসকে রিপোর্ট করবে—বুঝলে?’

মাথা নেড়ে আকিকো চলে গেল বাথরুমের ভেতর দিয়ে। ক্যাপ্টেন একটা চেয়ারে বসলো। মাউজারটা নামিয়ে রাখলো উরুর উপর। পকেট থেকে চুরোট বের করে ধরালো। গাঙ্গে ভরে গেল ঘরটা। রানার সিগারেটের তেষ্ঠী পেয়ে বসলো। বললো, ‘আমাদের নিয়ে কি করতে চান?’

‘একটু বেড়িয়ে আসবেন আমার জাহাজে করে।’—ক্যাপ্টেন হুরোটে তাঁন দিল। বললো, ‘বিয়ে করেছেন কদিন?’

রানা সোহানার দিকে তাকালো। বাঁ হাতটা তুলে দিল ওর কাঁধে। সোহানা আরো কাছে সরে এল। রানা বললো, ‘তিন মাস।’

‘তবে আমার জাহাজে আপনাদের নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হবে।’
—ক্যাপ্টেন বললো, ‘ভালো লাগবে।’

‘কিন্তু...?’

‘কোন প্রশ্ন করবেন না। সবাই আপাততঃ ধারণা করবে, আপনি জাপান চলে গেছেন।’—ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ালো। মাউজারটা তুলে বললো, ‘দু’জন এবার উঠে দাঁড়ান। মাথার পিছনে হাত রাখুন। ঠিক আছে...নাওচি?’

‘ইয়েস, ক্যাপ্টেন।’

‘ওদের জিনিস-পত্র সার্চ করা হয়েছে?’

‘না, ক্যাপ্টেন।’

‘শীঘ্রী সার্চ কর।’

এক মিনিটে ওদের স্ম্যটকেস সার্চ করা হলো। কিছু পাওয়া গেল না। বালিশের নিচে, বা অস্ত্র কোথাও কিছু নেই।

‘কিছু নেই ক্যাপ্টেন।’—জানালো নাওচি।

সোহানা রানার দিকে তাকালো।

ক্যাপ্টেন হঠাৎ সোহানার সামনে এসে দাঁড়ালো। আঙুল করে বললো, ‘আপনার হ্যাণ্ড-ব্যাগটা কোথায়, মিসেস্ মাসুদ?’

‘হ্যাণ্ড-ব্যাগ?’—সোহানা ঘেন আকাশ থেকে পড়লো।

‘হ্যাঁ, যেটা আপনার হাতে ছিল। কুমীরের চামড়ার তৈরী—এন্নার স্পোর্টে’ দেখেছি।’

সোহানা দাঁতে ঠেঁট কামড়ে ধরলো। একটু থেমে থেকে বললো,

‘বেড-সাইড ক্যাবিনেটে।’

ক্যাপ্টেন হেসে নাশটিকে ইশারা করলো। নাশটী বের করে আনলো।
ব্যাগটা। হাতে দিল ক্যাপ্টেনের। ক্যাপ্টেন ওজন নিয়েই হাসলো।
বললো, ‘ওজনটা কিন্তু কম না!’

রানা দেখলো, সোহানার মুখের রক্ত সরে গেছে। ব্যাগটা খুলে
বিছানার উপর ঢেলে দিল ক্যাপ্টেন। চিক্কাণী, ক্রমাল, লিপিষ্টিক, মানিবেগ
ক্রিপ-পেন — ষাদু-বাক্সের হাজার রকম জিনিস বেড়িয়ে পড়লো। কিন্তু
তাতে ভরস্কর কিছু পাওয়া গেল না।

হাসলো ক্যাপ্টেন। বললো, ‘দেখুন ডক্টর মাসুদ, নতুন বিয়ে করেছেন
হয়তো ভ্যানেট ব্যাগের গোপন খবর এখনো জানা হয় নি। দেখুন,
মেক্সেরা ষোল থেকে ছেচলিশ পর্যন্ত একরকম থাকে কি ভাবে। হাঃ হাঃ...’
— হাসি থেমে গেল ক্যাপ্টেনের। ব্যাগটা বিছানার উপর ফেলে
দিতে গিয়ে ফেললো না। গভীর আগ্রহে ব্যাগের ভিতরটা দেখলো,
চারিদিক হাতিয়ে হাতিয়ে ভিতরের একটা ক্রিপে চাপ দিল।
কার্পেটের উপর কিছু পড়লো।

ক্যাপ্টেন তুললো সেটা মেঝে থেকে। পয়েন্ট টু-টু বেরেটা। ছোট
একটা পিস্তল।

‘এটা কি ম্যাজিক সিগারেট লাইটার, না পারফিউম স্প্রেয়ার?’
—সোহানাকে জিজ্ঞেস করলো ক্যাপ্টেন।

সোহানা রানার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো, ‘আমার স্বামী
একজন বিজ্ঞানী আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে নামকরা লোক। দু-দুবার
তার জীবননাশের হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।’

‘গত তিন মাসেই?’—ক্যাপ্টেন বললো, ‘মানে তিন মাস হলো
আপনাদের বিয়ে হয়েছে...’

খতমত খেয়ে সোহানা বললো, ‘বিয়ের আগে আমি ওর সেক্রেটারী

হিলাম। পিস্তল রাখার জন্য পুলিশের পারমিশন আছে ...’

‘ঠিক আছে, এটা আপাততঃ আমার কাছে থাকছে এবং আপনার স্বামীর জীবন রক্ষার দায়িত্বও আমাদের। নাওচি...’— ক্যাপ্টেন এবার নিজের পিস্তলটা উঁচু করে ধরে বললো, ‘তুমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও, দেখে আকিকো এলো কি না।’

নাওচি বেরিয়ে গেল। রানা ক্যাপ্টেনের কার্যকলাপে একটা স্তম্ভতা দেখতে পেল। বোঝা যায়, এটাই ওর কাজ। এভাবেই এই ক্যাপ্টেন ধরে নিয়ে গেছে বৈজ্ঞানিকদের, এখন থেকেই। রানা তো ধরাই দিতে এসেছে।

দরজায় নক হল।

ক্যাপ্টেন দ্রুত ব্যালকনির দরজার পর্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। হাতে মাউজার উদ্ভত।

বেল-বয় ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে আকিকো। আকিকোর হাতে এবার একটা রেইন-কোট দেখা গেল। রেইন-কোটটা যে অকারণে ডান হাতের উপর ফেলে রাখে নি, বোঝা যায়। রানা জুতো পরলো। বেল-বয় জিনিস-পত্র নিয়ে বের হয়ে গেল আকিকো ওদের বের হতে নির্দেশ দিল।

নিচে নেমে এল রানা ও সোহানা। পেছনে আকিকো। ডেস্কে পৌঁছে রানা চাবি দিল। দু’এক জায়গায় সই করলো। ফিলিপিনো রিসেপশনিস্ট ছেলেটি রানার পিছনের কারো উদ্দেশ্যে মাথা নত করলো। বললো, ‘গুড মর্নিং ক্যাপ্টেন মন দিউ। আপনার লোককে পেলেন?’

‘না। ওরা আগেই নাকি এয়ারপোর্ট’ চলে গেছে। আমাকে এই রাতে আবার এয়ারপোর্ট’ যেতে হবে। একটা ট্যাক্সির জন্তে বলুন।’—ডেস্কে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন।

‘ট্যাক্সির জন্তে বলছি।’—বলে থেমে গেল ফিলিপিনো ছেলেটি,

‘এখনি ট্যান্ডি পাওয়া গেলেও দশ মিনিট সময় অন্ততঃ লাগবে ।
ড্রাইভারগুলো বড় আলসে । আপনার নিশ্চয়ই খুব তাড়া রয়েছে ।’

‘আমার সব কাজের তাড়া থাকে ।’—ক্যাপ্টেন মন দিউ বললো,
‘কাজের লোক আমি ।’

ক্লার্ক রানার দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, ‘এই তো ডক্টর ও মিসেস
মাসুদ রানা এয়ারপোর্ট’ যাচ্ছেন । এঁদের সঙ্গে আপনিও যেতে পারেন ।’

‘আপনার পরিচয় জেন খুশি হলাম, ডক্টর মাসুদ ।’—হাত
বাড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেন । বললো, ‘আমার নাম মন দিউ । আমাকে
যদি এয়ারপোর্ট’ পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দেন....বাধিত হই ।’—রানা
ক্যাপ্টেনের হাতের শক্ত ধারণ থেকে হাত বের করে নিল । দেখলো, কিছুক্ষণ
আগের স্টেই কঠোরতা নেই । কেমন যেন ক্ষুণ্ণবাক্য ভাব ফুটে
উঠেছে মুখে । কিন্তু বাঁ হাতটা পকেটে আছে, ও হাতে ধরা মাউজার ।

গাড়ির ব্যাক সিটে বসলো ক্যাপ্টেন এবং নাগচি । মাঝের সিটে
রানা ও সোহানা । ড্রাইভ করছে অল্প একজন, তার পাশে বসা
আকিকো ।

ম্যানিলা রানা এবং সোহানার কাছে পুরোনো শহর । ওরা
শহর দেখছিল না । শহরের আলোগুলো সরে সরে যাচ্ছিল, আবার
কখনো অন্ধকারের মধ্যে গাড়ি এগুচ্ছিলো । ওদের কথায় বোকা
যাচ্ছে, ফিলিপিনো এয়ারের লোক এদের সঙ্গে আছে । এ ড্রাইভারটা ?...
গাড়িটা ফোর্ট শান্তিয়াগোর পাশ দিয়ে এগিয়ে ডালপান ব্রীজে
গিয়ে থামলো । ম্যানিলা শহরের বুক চিরে বেরিয়ে গেছে পাসিজ
(Pasig) নদী । পাসিজ নদী-মোহনার কাছাকাছি ডালপান সেতু ।
ক্যাপ্টেন মন দিউ গাড়ি থেকে নামতে নির্দেশ দিল ওদের ।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো রানা । পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো
সোহানা । রানা ওর হাত ধরলো । অনুভব করলো সোহানার ক্রত

পালসের গতি। ওদের জিনিস-পত্র নামানো হল। গাড়িটা সাঁ করে বের হয়ে গেল। ডালপান ব্রীজের উপর দিয়ে অদৃশ্য হল।

ওদের ওঠানো হল ছোট একটা মোটর-বোটে। এবং মুহূর্তের মধ্যে ঝটঝট শব্দ তুলে বোট ছুটে চললো সমুদ্রের দিকে। কালো পানি, অন্ধকার রাতের প্রতিফলন। আশে-পাশে জ্বলছে, জ্বোনাকীর মত আলো। এদিক ওদিক মোটর বোটের শব্দ, মানুষের স্পন্দন।

—বোট ছুটে চলছে সমুদ্রের মোহনার উদ্দেশ্যে। ওদের উপর আকিকো ও নাভটির পিস্তল একভাবে চেয়ে আছে। মোহানা সব কিছুর সঙ্গে আমেরিকান গ্যাংস্টার ম্যাগাজিনে পড়া কোন ঘটনা মিলাতে চেষ্টা করছে কি?

মিনিট বিশেক পর বোট থেমে গেল। রানা দেখতে পেল সামনে একটা দৈত্যের মত কালো ছায়া। এখানে জ্বালগাটা প্রায় নির্জন। দূরে ম্যানিলা শহরের আলো। আরো দূরে মোটর-বোট, নৌকার আলো। কালো ছায়াটা ছোট আকারের সমুদ্রগামী জুনার। বোটটা জুনারের সঙ্গে লেগে দাঁড়ালো। আকিকো কার উদ্দেশ্যে যেন কি বললো—ওপর থেকে নেমে এলো রোপ-ল্যাডার। ক্যাপ্টেন উঠে গেল সবার আগে। আকিকো রানাকে উঠতে নির্দেশ দিল। রানা মোহানার হাত ছেড়ে দিল। মোহানা হাতটা আবার আঁকড়ে ধরতে গেল। রানা বাংলায় আশ্বস্ত করে বললো, ‘ভয় না পাবার চেষ্টা কর।’

উপরে উঠে এলো সবাই। বোটের ড্রাইভার আবার বোটটা চালিয়ে এগিয়ে গেল শহরের দিকে।

রানা জুনারটার পুরোপুরি চেহারা সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা করলো। কিন্তু টপটপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। চারিদিকটা সঁাৎসেতে। ওদেরকে ভিতরে নিয়ে আসা হল। এর মধ্যে রানা অনুমান করলো, এটা সম্ভব

ফিটের মত লম্বা। পানির লেভেল থেকে ডেকের উচ্চতা আট-নয় ফিটের মত।

এখানে সবাই নিজেদের মধ্যে চাইনিজে কথা বলছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন ইংরেজী ছাড়া কথা বলে না। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে অন্তরা ভাঙা ইংরেজীতেই কথা বলে। এদের কেউ আসলে জাপানী নয়, রানা অনুমান করলো।

ক্যাপ্টেন দিউ নাবিকদের একজনকে জিজ্ঞেস করলো, ‘আমাদের গেস্ট এসে গেছেন, হিসেপশনের ব্যবস্থা হয়েছে, পাও লিং?’

‘সব তৈরী ক্যাপ্টেন।’

‘এদের ঘর দেখিয়ে দাও। আমি আমার কেবিনে যাচ্ছি।’— ক্যাপ্টেন দিউ বললো, ‘ওঃ মাস্তুদ, আপনার সাজ পরে দেখা হবে।’

রানা বুঝতে পারলো নোজর তোলা হচ্ছে। অঙ্কার কেটে যাবার আগেই এরা নিরাপদ দূরত্বে চলে যাবে। পাও লিং রানাকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে চললো। পিছে আকিকো পিস্তল ধরে আছে। ডেকের এক প্রান্তে এসে নিচু হয়ে একটা চৌকো চাকনা তুলল নাঙটি। টচ’ জেলে ভিতরে দেখলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ‘নেমে পড়ুন ভেতরে।’

রানা প্রথমে নামলো। দশ তাকের লোহার খাড়া মই। সোহানাও নেমে এলো। ওর মাথা ভিতরে যেতেই উপর থেকে গুথটা বন্ধ হয়ে গেল। বণ্টু লাগানর শব্দও শুনলো ওরা। সোহানা অঙ্কারে মই থেকে নামবে কিনা ভাবলো। রানা ওকে ধরে নামিয়ে আনলো। এক মিনিট দু’জন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। অঙ্কারে চোখ কিছুটা অভ্যস্ত হলে চারিদিকটা ঘুরে দেখলো। একটা লোহার নেটে আবরিত ট্রাটেমে আলো উপরে জ্বলছে। ঘরটা জাহাজের মাল-ঘর। চারিদিকে কাঠের বাস।

নোংরা, অন্ধকার, ভেজাভেজা ভাব যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ। ষষ্ঠিতে দু'জনই ভিজ়ে গেছে। তারপর ইঞ্জিনের একঘেরে শব্দ। রান্না চারদিকের কাঠের দেয়াল দেখে বুঝলো, বের হবার একটাই পথ, যে পথে ঢুকেছে। হাসলো মনে মনে : এখানে বন্দী হতেই আসা, অথচ বেরবার কথা ভাবছে। অভ্যাস হয়ে গেছে। মানুষের বেঁচে থাকার সাধারণ প্রবণতা তাকে প্ররোচিত করেছে বেরবার কথা চিন্তা করতে। এভাবে বন্দী করে তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? সোহানার চেহারা দেখে মনে হল ভাবছে সবকিছুকে এখন থেকে মেনে নিতে হবে। এখন দু'জনই নিয়তির হাতের পুতুল। নিয়তি! অন্ধকারে নিয়তির কথা ভাবতে গিয়ে সেই চেনা বলিরেখার অকারণ বিভ্রান্তিতে ঢাকা দু'টো চোখ মনে পড়লো। মেজর জেনারেল এখন কি ম্যাপের সামনে বসে হিসেব করছেন?

রান্না এগিয়ে গেল কাঠের এয়ার-টাইট দরজার দিকে। এটা জাহাজের পিছনের দিক। সামনের দিকে একটা ছিদ্র পাওয়া গেল। তাতে চোখ লাগিয়ে ওপাশে কি আছে দেখার চেষ্টা করলো, কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু ডিজেলের গন্ধে বুঝতে পারলো, ওটা ইঞ্জিন-ঘর। একটা খোলা দরজা দেখে এগিয়ে গিয়ে দেখলো, পুরানো নোংরা ল্যান্টার্ন। বেসিনের ট্যাপ খুলে দেখলো, পানি আছে। সমুদ্রের পানি নয়। এক কোণে দেখতে পেল, ছয় ইঞ্চি ডায়ামিটারের ফোকর। উঁকি মারার চেষ্টা করলো, পারলো না।

রান্না সোহানার পাশে এসে দাঁড়ালো। বললো, 'হানিমুন কেমন জমেছে?'

উত্তর দিল না সোহানা। রান্না পুকেটে হাত দিয়ে সিগারেট এবং লাইটার বের করলো। একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে লাইটার জ্বালালো। সিগারেটে আগুন নেবার আগে সোহানার

স্বপ্নের সামনে ধরলো। না হানিমুন তেমন পছন্দ হচ্ছে না মেয়েটার। জামা ভিজ্জে গায়ের সঙ্গে সঁটে আছে। এমন চেহারা দেখা হয় নি মেয়েটাকে। অসহায় কল্পণ। বড় বড় চোখ দু'টো ভাষাহীন। চুল এলোমেলো, ভিজ্জে। সিগারেটে আগুন ধরিয়ে নিয়ে নিভিয়ে দিল লাইটটার। ডান পায়ের জুতোটা খুললো। মই-এর দিকে এগিয়ে গেল।

‘কি হচ্ছে?’—সোহানা বললো, ‘এখন কি করবেন?’

মই বেয়ে উঠে গেল রানা। বললে, ‘রুম সাভিস।’—জুতোর হিল দিয়ে ডাকনার গায়ে সজোরে কয়েকবার ঠুকলো। কাঠের ঢাকনায় শব্দ হল বেশ।

‘আপনার এখন অস্ত্র জাতীয় কিছু খুঁজে বের করা উচিত।’—সোহানা বললো, ‘নইলে নিশ্চয়ই ওরা আমাদের মেরে ফেলবে।’

‘মারলে তো এই সমুদ্রে এত কষ্ট করে নিয়ে এস কেন?’—রানা হাসলো, ‘মাথায় ঘিলু আছে? মারলে ঢাকাতেই মারতে পারতো। তোমার মনে রাখা উচিত, তুমি যার তার স্ত্রী নও, ডক্টর মাহুদ রানা তোমার স্বামী। ওরা ডক্টর মাহুদ রানাকে ব্যবহার করার জন্মে নিয়ে যাচ্ছে—মারতে হয় পরে মারবে। তাছাড়া ক্যাপ্টেন দিউকে আর যাই মনে হোক, খুনে মনে হয় না।’—রানা আরো কয়েকবার হিল ঠুকলো।

উপরের পাটাতনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। এবার কেউ ঢাকনা খুলছে। ঢাকনা কিছুটা ফাঁক হল। টেবের আলো এসে ভেতরে পড়লো। উঁকি দিল পাও লিং। বললো, ‘আপনারা ঘুমোতে চেষ্টা অথবা অস্ত্র কিছু করছেন না কেন? শুধু শুধু গোঙগোল!’

‘আমাদের জিনিস পত্র কোথায়?’—রানা বললো, ‘শুকনো কাপড় ছাড়া অস্ত্র কিছু করা বা ঘুম কোনটাই সম্ভব নয়।’

—সুটকেস এল। সেই সঙ্গে এল ক্যাপ্টেন দিউ। তার এক হাতে পিস্তল অস্ত্র হাতে টা’। ডিজেলের গন্ধ উপঢিয়ে ক্যাপ্টেনের

মুখের হইন্দির গন্ধে ভরে গেল এক মুহূর্তের জন্তে । আবার পুরানো
বমি আসা গছ । ক্যাপ্টেন বললো, 'স্ব্যটকেসগুলো ভালোমত চেক
করতে সময় লাগলো—কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো ?'

'না বেশ আরামেই আছি ।'—রানা বললো, 'এ ঘরটা কারা সেটেড
করেছে ?'

হো হো করে হাসলো ক্যাপ্টেন দারুণ রসিকতা মনে করে ।
বললো, 'শুকনো নারকেলের শাঁস আর হাঙ্গরের কাঁটা রাখা হয়েছিল ।'
ফরাসী রেষ্টোঁরায় তেত্রিশ বছরের পুরানো নেপোলিয়ন ব্রাণ্ডির গছ
নেবার মত করে শ্বাস দিয়ে ক্যাপ্টেন বললো, 'গছটা বেশ স্বাস্থ্যকর, সবাই
বলে !'

'তা বটে !'—রানা রেগে বললে, 'এ জেলে কতক্ষণ থাকতে হবে
আমাদের ?'

'সকাল আটটার আপনাদের ব্রেকফাস্ট দেওয়া হবে ।'—প্রশ্নটা
এড়িয়ে গেল ক্যাপ্টেন । তারপর সোহানার দিকে তাকিয়ে বললো,
'দুঃখিত মিসেস মাসুদ, এ জাহাজে আপনার মত মহিলারা খুব
একটা চডেন না—তাই তেমন আরামের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না ।
হ্যাঁ, আপনারা জুতো পায়ে দিয়েই যুঁমোবেন ।'

'কেন ?'

'পিকিংকরোচেস'—ক্যাপ্টেন বললো, 'এরা পায়ের তলার প্রতি
খুব পক্ষপাতিত্ব দেখায় !'—ক্যাপ্টেনের হাতের টর্চ জলে উঠলো ।
আলো গিয়ে পড়লো এক কোণে । রানা সোহানা দু'জনই দেখলো,
আরশোলা, চীনা আরশোলা । আকারে বিরাট । এবার ভয় পেয়েছে
সোহানা । রানার কনুই জড়িয়ে ধরলো । বললো, 'এত বড় !'

'শুকনো নারকেলের শাঁস আর ডিজেল তেল খেয়ে খেয়ে এই
অবস্থা হয়েছে ।'—পাণ্ডা লিং দাঁত বের করে বললো, 'ডি.ডি.টি.-ও ।'

‘ওরা...।’

‘হয়েছে, ওদের জীবনী শোনার আগ্রহ উঠেরে এখন নেই।’—
ক্যাপ্টেন রানার হাতে নিজের টর্টো দিয়ে বললো, ‘এটা রাখুন,
সকালে দেখা হবে।’—বলেই উপরে উঠে গেল।

ওরা বেরিয়ে গেলে রানা কাত হয়ে থাকা তক্তা টেনে উপরে
তুলতেই মাঝখানের জায়গাটার একটা প্রাটফর্ম হয়ে গেল। রানা বসে
পড়ে সোহানা কেও বসে পড়তে ইচ্ছিত করলো। ‘সোহানা পাশেই
বসলো। রানা স্যুটকেসটা টেনে বললো, ‘শাট’টা বদলে নাও।’

সোহানা স্যুটকেস খুলে একটা ‘শাট’ বের করে উঠে দাঁড়ালো।
রানার দিকে পেছন ফিরে শাট’টা খুলে এক কোণে ফেলে দিতে নতুন
শাটে পিঠটা ঢেকে বার হুক আলগা করলো। বের করে আনলো
দুই হাতের ভেতর থেকে। ছুড়ে ফেলে দিল ঘরের কোণে।

সোহানা শাটের বোতাম লাগিয়ে এসে দাঁড়ালো এদিকে। বসে
পড়লো রানার পাশে। রানা স্যুটকেস দু’টো মাথার কাছে রেখে
বললো, ‘শুয়ে পড়।’—পাশ ঘেঁষেই শুয়ে পড়লো সোহানা। রানা
বুঝলো, স্যুটকেস মাথায় দিতে বেচারীর কষ্ট হচ্ছে।

রানা শুয়ে পড়ে বললো, ‘আমার হাতে মাথা রাখবে?’

সোহানা কিছু বললো না। রানা হাতটা সোহানার মাথার নিচে
দিয়ে কাঁধের উপর টেনে আনলো চুল-ভরা মাথাটা! সোহানা একটু
নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে নিল। হাতটা রানার বুকের উপর আড়াআড়িভাবে
রাখলো। রানা ওর চুলের গন্ধ পাচ্ছিল। বুকের নরম স্পর্শ মনে
এক বিচিত্র অনুভূতি ছড়াচ্ছিল। কিন্তু ভাবছিল, অস্ত কথ...। হঠাৎ
সোহানা বললো, ‘টর্টো দাও তো একটু।’

রানা কোন কথা না বলে ওর বুকের উপর রাখা হাতে টর্টো
দিল। সোহানা টর্টের আলো আরশোলাগুলোর উপর ফেললো।

ওরা একটু নড়ে চড়ে গেল ।

‘রানা ?’

‘বল ।’

‘এত বড় আরশোলা দেখেছো আগে ?’

‘তোমার মত ছেলেমানুষ দেখি নি ।’

সোহানা আলো নিভিয়ে মাথা সরিয়ে নিতে গেল । রানা নড়তে দিল না । সোহানা চুপ করে পড়ে রইল । রানা ওর মুখের ওপর থেকে চুলঙলো সরিয়ে দিয়ে বললো, ‘স্বমোতে চেষ্টা কর । কখন আবার স্বমোতে পারবে তার ঠিক নেই ।’

সুন্যারটা প্রবল বেগে ছুটে চলেছে । স্বমোতে পারলো না রানা বাকী রাতটা । কিন্তু সোহানা ঘুমের অতলে হারিয়ে গেল ।



সোহানার মাথাটা রানার কাঁধ থেকে নেমে গেছে । ও রানার হাতটা আঁকড়ে ধরে ঘুমচ্ছে । সুন্যারের প্রচণ্ড দোলায় হঠাৎ উঠে বসলো । ‘স্বমস্বম’ চোখে রানাকে দেখে হাসলো । রানা ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘এখন কেমন লাগছে ?’

‘উ...ম...ভাল ।’—বাঁ হাতটা তুলে কালো-চওড়া ব্যাণ্ডে বাঁধা বড়িটা দেখলো । বললো, ‘গাড়ে আটটো । আমরা এখন কোথায় আছি ?’

‘প্রশান্ত মহাসাগরের কোথাও।’—উঠে বসতে বসতে বললো রানা। কামরাটা এখন বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা ভেটিলেশনের ফোকড় দেখা গেল। রানা প্রাউফর্ম থেকে নেমে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। এ জায়গাটা ফাঁকা। রানার কানে কতকগুলো কথা ভেসে এল। উপরে কেউ কথা বলছে। একটা বাস টেনে নামালো। এবং তার উপর দাঁড়িয়ে ফোকড়ে কান লাগালো। ট্রান্সপেট আকারের ভেটিলেটর হেড-ফোনের কাজ দিচ্ছিল। যদু কথাও এখানে শব্দ তরঙ্গে এসে এম্‌গ্রিফাই হয়ে যাচ্ছিল। রানা দু’জনের কণ্ঠে কথা-বার্তা শুনছে— তারা ভেটিলেটরের কয়েক ফুট দূরেই যেন রয়েছে। চীনা ভাষায় কথা বলছিল ওরা, যা রানার বোধগম্য নয়। তবু কিছুক্ষণ কান পেতে থেকে নেমে এল বাস থেকে।

‘এটা কি হল?’

‘কিছু না। তবে এখান থেকে আমরা ডেকের কথাবার্তা শুনতে পাবো, বুঝতেও পারবো যদি তারা চাইনিজে না বলে।’

‘চাইনিজ।’—সোহানা বললো, ‘আরো একটা কথা তোমাকে জানানো উচিত ছিল, এ মিশনে আমার আসার ষোণ্যতার মধ্যে একটা— আমরা চাইনিজ জানি কিছু কিছু।’

রানা মুগ্ধ হয়ে তাকালো সোহানার দিকে। বুড়োর বুদ্ধি আছে ৩ মনের ভাব প্রকাশ না করে শুধু বললো, ‘ক্ষিধে পেয়েছে?’

মাথা নাড়লো সোহানা। পেয়েছে।

রানা আবার জুতোর হিল ঠুকে দিয়ে এলো। ঢাকনা খুলে গেল। উঁকি দিল পাও লিং-এর পিস্তল, তারপর তার ভোঁতা মুখটা। রানা বললো, ‘সকালেই খাবার দেবার কথা ছিল।’

‘দশ মিনিটের মধ্যেই এসে যাচ্ছে।’—আবার ঢাকনা বন্ধ হল।

দশ মিনিটের আগেই ঢাকনা খুলে গেল আবার। একটা ছোকরা

নেমে এল ট্রে হাতে নিয়ে ।

ওদের দু'জনের চোখ খয়েরী রঙের অঙ্কিত একটা জিনিসের উপর হোঁচট খেল । রানা জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি জিনিস ?'

'ভালো—পুড়ি।'—বললো ছেলেটি, 'খুব ভাল । এই যে কফি । এটাও খুই ভাল ।'—ছেলেটা ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বললো । ওরা কিছু বলার আগেই ছেলেটা মই বেয়ে ওপরে উঠে গেল ।

রানা পুড়ি এর কিছুটা অংশ তুলে মুখে দিয়ে দেখলো জঘন্ট স্বাদ । সোহানা রানাকে মুখে দিতে দেখেই বমি করার উপক্রম করলো । রানা হেসে ফেললো । 'সোহানা বললো, 'না খেয়েই থাকতে হবে । শুধু কফিই খাওয়া যাক ।'—কফির পটটা টেনে নিল ও । রানার চোখ আটকে গেল কাঠের বাজের উপরে । বললো, 'না, না খেয়ে থাকতে আমি পারবো না ।'—উঠে গেল বাজের কাছে । ভেতরে টচ' মেরে বললো, 'জিনের বাতল মনে হচ্ছে ।'

'ক্ষিদের চোটে শর্ষেফুল ছাড়া আর কিছু দেখছি না আমি ।'—সোহানা বললো, 'তুমি দেখছ জিন ।'

রানা বাজের একটা কাঠ খসিয়ে ফেলল । এগুলো এত হাত্তা কেন ? ভেতরে হাত দিয়ে খড়ের ভেতর থেকে বের করে আনলো একটা বোতল । মুখ খুলে গন্ধ শুকে চুক দিয়ে দেখলো । ইয়া, ফান্টা জাতীয় পানীয় । রানা আরো একটা বোতল বের করে সোহানাকে দিল । সোহানা বললো, 'এতে পেট ভরবে ?'

'দাঁড়াও না, এ-বরে আমাদের লাকের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে ।

রানা মহা উৎসাহে অস্ত্র বাস্ত্রলোয় কি আছে খুঁজতে লেগে গেল । সোহানাও সাহায্যের জন্তে হাত লাগালো । প্রথম তাকের এক সারি খাবারের প্যাকিং-বস্ত্র থেকে ওরা বের করলো ফলের বাস্ত্র, পনির, এবং

মাংস। দু'জন মিলে পেট ভরে খেয়ে আরো দু' বোতল পানীয় পান করলো। খাওয়া শেষ করে সোহানা বললো, 'এবার আর এক দফা ঘুম দেওয়া যাক।'—রানার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি তো স্বাভাবিক ঘুমোতে পারো নি।'

'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুমি দেখলে কেমন করে?'

'বুঝতে পারা যায়।'—সোহানা বললো, 'তুমি জেগে কি ভাবছিলে? ওদের হাতে তো আমরা ইচ্ছে করেই ধরা দিয়েছি, তাই না?'

'ভাবছিলাম, এরা কারা, আমরা কোথায় যাচ্ছি।'

'এরা কি, জানি না। তবে...'—সোহানা বললো প্যাকিং বাসগুলো দেখিয়ে, 'এগুলো কন্সোভিয়েশন সরকারের।'

'কি করে বুঝলে।'

'বাসের গায়ে চাইনিজ ভাষায় লেখা আছে।'

রানা বললো, 'আর কি লেখা আছে।'

'প্রত্যেকটার গায়ে লেখা বাতিল। এটাতে আছে এ্যালকহল কমপ্রেশ, স্প্রিট এয়ার আর্ম।'

এবার রানা এক পাশের বাসগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। প্রথমটা সরিয়ে ফেললো, 'এটাতে কি লেখা আছে?'

'বাসনোকুলার—জিনিসগুলো আসলে রেড-চায়না কন্সোভিয়েশন দান করেছে।'—সোহানা অল্প বাসগুলোর লেখা পড়ে গেল, 'এয়ার ক্রাফটের লাইফ বেট।'—রানা বাসটা খুললো। উপরের লেবেলে মিথো নেই : লাল রঙের লাইফ-বেট, কার্বন-ডাই-অক্সাইড চার্জ করা হলদে সিলিণ্ডার রয়েছে সঙ্গে। সঙ্গে রয়েছে আরেকটি সিলিণ্ডার। তার উপর, চাইনিজ পড়তে না জানলেও বুঝতে অসুবিধা হল না, এটা শার্ক রিপেলেন্ট।

'এ কুনায়টা যদি চাইনিজ বা কন্সোভিয়েশন সরকারী জিনিস হয়

তবে এরা আমাদেরকে কিড্‌নাপ করলো কেন ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?’
—সোহানা জিজ্ঞেস করলো, নিজেই বললো, ‘অবশ্যি এ লেখাগুলো এরা
নিজেরাও লিখতে পারে।’

‘এরা চাইনিজ হোক আর কষোড়িয়ান হোক—কোন সাহসে
আমাদের এখানে এসব জিনিস পত্রসহ বন্দী করলো ? এখান থেকে
যদি পালাতে চাই, অনায়াসে পালানো যায়।’—রানা বললো, ‘অবশ্যি
এরা নিয়ে যাচ্ছে ডঃ মাসুদ রানাকে, স্পাই মাসুদ রানাকে নয়।’

রানা আরেকটা বাস্তব খুলে ভেতর থেকে নীল কাগজে মোড়া
একটা প্যাকেট বের করলো। এতে ‘বিপদ’ কথাটা কয়েক ভাষায়
লেখা আছে। ইংরেজীটা পড়লো—‘এ্যামোন্সাল’। রানা খুব সাবধানে
ওটা যত্নসহকারে নামিয়ে রাখলো। সোহানা মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস
করলো, ‘ওটা কি ?’

‘পঁচিশ পারসেন্ট অ্যাগলমনিয়াম পাউডার। শক্তিশালী ব্লাস্টিং
এক্সপ্লোসিভ। এ কুনার এবং এর সব ক’জনকে উড়িয়ে দেবার পক্ষে
যথেষ্ট’—রানা বললো, ‘এভাবে এই গরম জায়গায় অসাবধানে রাখলে
যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে।’—পরের বাস্তবটা আর দেখলো
না। বললো, ‘ওতে নিশ্চয়ই নাইট্রোগ্লিসারিন আছে।’

রানার কপালে ঘামের বিন্দু ফুটে উঠেছে। সোহানা হঠাৎ বললো,
‘তুমি ভয় পাচ্ছো ?’

‘ভয় !’ রানা বললো—‘না। সম্ভব হয়ে উঠছি।’—রানা দেখলো
মেশিনগানের বেণ্ট এ্যামুনেশন। কিন্তু আর কিছু দেখার চেষ্টা করলো
না। সোহানার মুখ সাদা হয়ে গেছে। অত হাস নিচ্ছে, ঘেন হাস
নিতে কষ্ট হচ্ছে। রানা পিছনের দিকে এগিয়ে গেল। চোখ বুলিয়ে
নিলো জিনিসগুলোর উপর : ছয়টা ডিজেলের ড্রাম রয়েছে, তাতে
ভর্তি কেরোসিন ও ডি. ডি. টি। পাশে সাজানো অনেকগুলো ফ্রেশ-

পানির ড্রাম। পাঁচ গ্যালনের ড্রাম, সহজেই বহন করা যায়। বোঝা যায়, এ পানি স্কনারের জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। একটা লোহার চকচকে বাস্র দেখে কৌতূহলে ডালাটা খুললো। চোখে পড়লো কিছু পুরানো নাট বস্ট্র রাখা রয়েছে; হাতুড়ি জ্যাক, বটল স্কু ইত্যাদি।

সোহানাকে নীরব দেখে তাকালো রানা। দেখলো, বসে পড়েছে ও গতকালের ‘বিছানায়’। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। দু’চোখে একটা শূন্য, অসহায় দৃষ্টি। রানা ক্রত পায়ে ওর কাছে এসে দাঁড়ালো। সোহানা মুখ তুলে তাকিয়ে আছে, হাসার চেষ্টা করলো, পারলো না। কপালের চুল সরিয়ে দিয়ে রানা জিজ্ঞেস করলো, ‘খারাপ লাগছে?’

‘হ্যাঁ—সোহানা বললো, ‘আমি অসুস্থ বোধ করছি।’

রানা চারদিকটার মুহূর্তে চোখ বুলিয়ে গত রাতের মত, বাঁ পায়ের জুতো খুলে মই বেয়ে উপরে উঠে গেল, ঠুকলো সজোরে।

এবার ডালা খুললো ক্যাপ্টেন দিউ নিজে। রানাকে মইয়ের মাথায় দেখে হাতের চুরোটটা নামালো। কিন্তু তার মুখ খোলার আগেই রানা বললো, ‘ক্যাপ্টেন, আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার বাতাস দরকার। ডেকে এসে বসতে পারে ও?’

‘অসুস্থ!’—ক্যাপ্টেন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো, ‘জর?’

‘না, সী সিক।’

ক্যাপ্টেন দুঃখিত হয়েছে। কিছু না বলে ডেকটা দেখলো। তারপর বললো, ‘দাঁড়ান, এক মিনিট।’—দূরে দাঁড়ানো আকিকোকে কি যেন ইঙ্গিত করলো। আকিকো ডেক টেবিলে রাখা বায়নোকুলারট নিয়ে ক্যাপ্টেনের হাতে দিল। ক্যাপ্টেন ৩৬০০ দিগন্তরেখায় দৃষ্টি-ক্ষেপণ করে চোখ থেকে ওটা নামিয়ে বললো, ‘আপনার স্ত্রী উপরে আসতে পারেন। ইচ্ছে করলে আপনিও।’

নীল, ঘষা কাঁচের মত আকাশে জলজলে সাদা সূর্য। পশ্চিম দিকে সমুদ্রের রঙ সবুজ মেশানো নীল, পূর্বের রঙ গাঢ় সবুজ, সূর্যের প্রতিফলনে চকচক করছে। বাতাস ঢেউ দিয়ে খেলছে, কানের কাছে বাতাসের একঘেয়ে শব্দ বেজে যাচ্ছে। সোহানার খোলা চুল উড়ছে। রানা দেখলো, চারদিকে কোনকিছু নেই। চোখ যতদূর যায় মেলে দেখার চেষ্টা করলো—কাখাও কোন জাহাজের চিহ্ন দেখলো না।

‘দেখ, একটা পাখিও নেই, উড়ন্ত মাহ পৰ্যন্ত না।’—ভয় ফুটে উঠলো সোহানার কণ্ঠে, ‘আমরা যাচ্ছি কোথায়?’

‘কোথায় যাবো তা জানলে ত প্লেন চাটার করে চলে আসতাম। ঘুমাও।’

‘হ... ম্।’—সোহানা ডেক-চেয়ারে গা বিছিয়ে চোখ বন্ধ করলো।

রানা দেখলো, ডেকের ওপাশে একটা ভেটিলেটরের মুখে দাঁড়িয়ে আছে নাগচি, হাতে সাব-মেশিনগান। রানা মেশিনগানের ক্ষুধার্ত মুখ থেকে চোখটা সরিয়ে কুনারের উপরে নিবন্ধ করলো। দেখলো, রাতে যা ভেবেছিল তা নয়। কুনারটা বেশ বড়, অন্ততঃ একশো ফিট লম্বা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কুনার। রানা দেখলো, রেডিও-ক্রম এবং তার সামনের ভেটিলেটরের ট্রান্সমিটমুখ রেডিও-ক্রমের দিকে ফেরানো। রেডিও-ক্রমের ওপাশে ক্যাপ্টেনের কেবিন। রানার বিস্মিত চোখের দৃষ্টি সোহানার উপর ফিরে সহজ হল। ঘুমুচ্ছে? চোখ বন্ধ। বুক একতালে ওঠা নামা করছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে। শার্টের একটা বোতাম খোলা। বাতাস ঢুকে ফুলে ফুলে উঠছে শার্টটা। আবার লেগে যাচ্ছে ব্রেসিয়ার-হীন বুকের সঙ্গে। স্পন্দন লাগছে কাত হয়ে থাকা চুলে ঢাকা করুণ মুখ, বুকের নরম অবস্থান। বাতাস, সমুদ্র, সূর্য। রানা চোখ বুঁজলো। ভাবলো, বাতাস, খোলা চুল, সমুদ্র, আমি, সোহানা। ভাবলো সোহানা ও আমি। ভাবলো আমি।

ঘুম থেকে উঠে বসলো রানা। ঠিক তখন দুপুর। মাথার উপর খাড়া সূর্য। দেখলো, পাশে বসা ক্যাপ্টেন। দেখলো, সোহানার মুখ চলে ছেয়ে গেছে। গভীর ঘুমে একেবারে তলিয়ে গেছে মেয়েটি।

ক্যাপ্টেন বললো, ‘আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগাততঃ এটা চলবে?’—ক্যাপ্টেন ইঙ্গিত করলো হাতের ব্লাস্টার্স দিকে।

রানা বললো, ‘ওতে কি আছে —সান্নানাইড?’

‘কচ।’ — ক্যাপ্টেন না হেসে বললো, এবং পাশের বোতল থেকে আর একটা গ্রাস ভরে এগিয়ে দিল। সোহানাকে দেখিয়ে বললো, ‘উনি খুব ক্লান্ত।’

‘ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে!’—রানা কচ চুমুক দিয়ে হঠাৎ প্রসন্ন করলো, ‘আপনি কার হয়ে কাজ করছেন?’

‘কি কাজ?’—গ্রাসে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেল ক্যাপ্টেন দিউ ও অবাক হয়ে ডাকাল রানার চোখে।

‘আমাদেরকে এভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়, এবং কেন?’

‘আপনার আরো একটু ধৈর্য থাকা উচিত, ডক্টর মাসুদ।’

‘আমাদেরকে কতক্ষণ থাকতে হবে এভাবে?’

একটু চিন্তিত দেখা গেল ক্যাপ্টেনকে। বললো, ‘আমিও তাই ভাবছি। ওরা আগে খুবই উৎসাহী ছিল অথচ এখন অল্প কথা বলছে, বুঝতে পারছি না।’

‘ওরা ওসব কথা গতরাতে বললে আপনাকে এত কামেলায় পড়তে হত না?’—চট করে প্রশ্ন করলো রানা।

‘তখন ওরা জানতো না। এই পাঁচ মিনিট আগে ওদের সঙ্গে

কথা বলেছি রেডিওতে। আবার কথা বলবো নাইনটিন আওয়ারে, ট্রিক সাতটার, তারপর আপনার সম্পর্কে আমরা অল্প কিছু ভাববো।’ —ক্যাপ্টেন কথাগুলো বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর ভাকালো সোহানার দিকে। এক নজরে তাকিয়ে থেকে বললো, ‘আপনি ভাগ্যবান ডক্টর মাসুদ। বড় মিষ্টি দেখতে আপনার স্ত্রী!’

‘ভাগ্যে তা সইবে কি?’

উত্তর দিলো না ক্যাপ্টেন। কিছুক্ষণ নীরবে পান করে চললো, তারপর বললো, ‘আমার একটি মেয়ে আছে এই বয়সী — হয়তো দু’এক বৎসর কম হবে বয়স। পড়াশুনা করছে পিকিং বিদেশী ভাষার বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওখানে ও এশিও ভাষার উপর ডিগ্রী নিচ্ছে। ও জানে, ওর বাবা কনোডিয়ান নেভীতে আছে। হয়তো ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না।’

‘আপনি কোন্ দেশী?’

‘দেশী’ — ক্যাপ্টেন চুপ করে থেকে বললো, ‘এক সময় ছিল ইন্দোনেশিয়া। কিন্তু এখন দেশে ঢোকার অনুমতি নেই। এখন আমার দেশ কনোডিয়া।’

‘ওখানকার নতুন সরকার আবার আপনাকে পরদেশী করে দেবে?’

ক্যাপ্টেনের মুখটা হঠাৎ করুণ মনে হল। উঠে দাঁড়ালো। রানা জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনি কার সঙ্গে এ কাজ করছেন?’

উত্তর দিল না ক্যাপ্টেন। বোতলটা টেবিল থেকে তুলে নিলে কেবিনের দিকে চলে গেল।

বিকেল পাঁচটা। সোহানা পায়চারী করছিল ডেকের উপর। বলছিল, তার ভীষণ ভালো লাগছে। রানা দেখল, শীত শীত

বাতাসে কুঁকড়ে যাচ্ছে ও। এখন নিচ থেকে একটা কিছু নিয়ে আসা প্রয়োজন। ঠিক তখনই ক্যাপ্টেন হস্তদত্ত হয়ে এসে দাঁড়ালো। তার হাতে বায়নোকুলার। বললো, ‘ডক্টর’, এবার আপনাদেরকে নিচে যেতে হবে।’

রানা অনুমান করলো, তার শক্তিশালী বায়নোকুলারে নিশ্চয়ই কোন জাহাজ বা দ্বীপ ধরা পড়েছে। কোন রিস্ক নিতে চায় না সাবধানী ক্যাপ্টেন

নিচে মই বেয়ে নামতে নামতে সোহানা বললো, ‘আবার হোটেল হিলটনের প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটে একটা রাত!’

‘রাতটা হয়তো কাটাতে হবে না।’—রানা বললো, ‘আজ সন্ধ্যায় আমাদেরকে এখান থেকে বেরুতে হবে। নইলে ওরাই বের করে ফেলে দিবে সমুদ্রে পায়ে বেড়ী দিয়ে।’

‘মানে।’—সোহানা বললো, ‘তুমি না বলেছিলে ক্যাপ্টেন আমাদেরকে মেরে ফেলবে না?’

‘কিন্তু মনে হয়, আমি ধরা পড়ে গেছি।’—রানা বললো, ‘ক্যাপ্টেন আজ সারাদিন ড্রিল করেছে, কিছু একটা ভাবছে, সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করেছে। আমি ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছি তুমি যখন ঘুমিয়েছিলে। বার্তা আমাদেরকে চেয়েছিল তাদের আর আমাদের দরকার নেই।’

‘কেন?’

‘যে জন্তে ফুয়েল এক্সপ্লোজিভ দরকার পড়েছিল সে কাজ শেষ হয়ে গেছে অথবা ওরা কোন ভাবে খবর পেয়ে গেছে, আমরা নকল লোক।’

‘ক্যাপ্টেন বললো?’

‘পরিকারভাবে কিছুই বলে নি। তবে ক্যাপ্টেন নিজেরই একটা বিপাকে জড়িয়ে পড়েছে, অনুমান করছি। সাতটার ঠিক খবর পাওয়া বাবে।’—রানা দেখলো, সোহানা আবার ভয় পেয়ে গেছে। রানা ওর

কাঁধে হাত রাখলো, ‘ভয় পেয়েছো?’

‘ভয়? হ্যাঁ। হঠাৎ আমি আমার ভবিষ্যৎটা দেখার চেষ্টা করলাম, সেখানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না অন্ধকার ছাড়া।’—সোহানা বসে পড়ল, ‘তোমার ভয় হচ্ছে না, রানা?’

‘হচ্ছে।’—রানা আশ্বস্ত করে উচ্চারণ করলো।

‘আমি বিশ্বাস করি না।’—অস্তির কণ্ঠে প্রতিবাদ করলো সোহানা। তারপর কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, ‘ভয় পেলে এই সীমাহীন সমুদ্রের বুকে পালাবার কথা বলতে পারতে না, এ সোখিন চিন্তা তোমার মাথায় আসতো না।’

‘ভয় পেলেই তো মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারায়, তাই না?’—রানা এগিয়ে গেল সেই বালুগুলোর দিকে। বললো, ‘কাণ্ডজ্ঞান হারালেও এটুকু বিশ্বাস করতে পার, আমি যত্নের ভয়ে আত্মহত্যা করবো না। মরার আগে বাঁচার শেষ চেষ্টা করতে হবে।’

হঠাৎ উপরে ঢাকনার বস্ট্র খোলার শব্দ শোনা গেল। রানা কোণ থেকে সরে এসে সোহানার পাশে বসে কাঁধের উপর হাত তুলে দিয়ে ওকে বুকের কাছে টেনে আনলো। ঢাকনাটা খুলে যেতেই আবার ছেড়ে দিল। রাতের খাবার দিয়ে গেল আকিকে। ওর মুখ গম্ভীর।

ডিনার শেষে রানা বললো, ‘তুমি ভেটিলেটরের নিচে দাঁড়িয়ে ওরা কি বলে তার প্রত্যেকটা কথা শোনার চেষ্টা কর। আমি ততক্ষণে কিছু শুধিয়ে নিই।’—রানা একটা বালু টেনে তার উপর সোহানাকে উঠিয়ে দিয়ে চলে এল পেছনের দিকে লোহার মইয়ের কাছে। তিন সিঁড়ি উঠে একটা আনুমানিক হিসেব করে নিল ঢাকনা ও শেষ সিঁড়িটার দূরত্ব। নেমে এসে লোহার সেই নাট-বস্ট্রের বাজের ডালা খুললো। বের করলো জ্যাক, দেখলো মাঝের হাতল ঘুরিয়ে, তেল দেওয়াই আছে। দুটুকরো শক্ত কাঠ জোঁগাড় করে একপাশে শুধিয়ে

রেখে রানা এয়ার-ক্রাফট্‌ টাইপের 'লাইফ' লেখা বাজটা বুললো ও মোট বারোটা লাইফ-বেন্ট রয়েছে। রবার ক্যান্ডাসে মোড়া—চামড়ার ফিতে সাধারণ লাইফ-বেন্ট থেকে একটু অন্তরকম দেখতে। CO₂ সিলিণ্ডার ও শার্ক রিপেল্যান্ট ছাড়া আরো একটা ছোট ওয়াটার প্রুফ সিলিণ্ডার রয়েছে—তার থেকে একটা তার চলে গেছে কাঁধের ফিতের সঙ্গে লাল আলোয়। সিলিণ্ডারে ব্যাটারী আছে।

রানা সব শুধিয়ে রেখে ঘড়ি দেখলো, সাতটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। রানা সোহানার কাছে এল। সোহানা একভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

'কিছু শুনছো?'

'হুঁ'—সোহানা যেন লজ্জা পেল। বললো, 'দু'জন চাইনিজ ম্যাকাও অফিসের মেয়েদের সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করছে।'

'ইন্টারেস্টিং?'—শার্ট খুলে ফেলে স্মাটকেস থেকে একটা নীল গেঞ্জি বের করে গায়ে দিল।

'ইন্টারেস্টিং?'—একেবারে লাল হয়ে বললো, 'বাজে!'

রানা একটা শর্টস্‌ নিয়ে ওপাশে চলে গেল। প্যান্টের জিপার নামিয়ে খুলে ফেলে দিল। শর্টস্‌ পরলো। এসে আবার দাঁড়ালে সোহানার কাছে।

সোহানা এ চেহারার রানাকে দেখে নি। ও চোখ ফিরিয়ে নিল। আবার তাকালো। রানার দৃঢ়পেশী পোড়াটে শরীরের দিকে। লোকটাকে কেমন ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। মুখটা গভীর করে রাখলে নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। অথচ মেজর-জেনারেল বলেন, রানার মধ্যে একটা মন আছে—সংবেদনশীল মন।

রানা বললো, 'তোমাকেও এরকম কিছু পরতে হবে। যাও তিন মিনিট সময় দিলাম।'

সোহানা কোন কথা বলতে পারলো না। হুম। গভীর মুখ-
 একাগ্রভাবে কিছু ভাবছে রানা। সোহানা নেমে এল প্যাকিং বাক্স
 থেকে। স্মার্টকেস খুললো। দেখলো, রানা প্যাকিং বাক্সে উঠে দাঁড়িয়েছে।
 তিন মিনিটে হল না। সাত মিনিট পরে ফিরে এল সোহানা একটা
 প্যাকিং বাক্সের আড়াল থেকে। ওর পরনে গভীর নীল রঙের শর্ট'স্-
 টাইট হাতাকাটা একই রঙের অরলনের সোয়েটার। রানা তাকালো
 সোহানার দিকে। চোখ একমুহূর্তের জন্যে প্রশংসা করলো মেরেটিকে।
 তারপর নেমে পড়লো বাক্স থেকে। বললো, 'তুমি শুনতে থাকো, ওরা
 এখনই কথা বলবে। এখন ঠিক সাতটা। এখানে দাঁড়াও, প্রত্যেকটি
 কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।'

রানা দাঁড়ালো। আবার চলে গেল পেছনের দিকে। ক্যানভাসের
 বেষ্ট লাগানো দু'টো পানির ড্রাম বের করে এনে ঝাঁকালো। না,
 কোনোদিন দিয়ে পানি বেরোতে পারে না। অতএব ঢুকবেও না।
 ল্যাট্টিনের দরজা দিয়ে ও দু'টোকে নিয়ে গিয়ে ট্যাপ খুলে দিল
 এবং ছুটে এলো সোহানার কাছে। সোহানা কথা শুনছে। রানার
 দিকে তাকাবার অবসর নেই। রানা বুঝলো, তার খাটুনি কথা যাবে
 না। পালাতে হবে। উঠে দাঁড়ালো রানা ছোট একটা প্যাকিং-
 বাক্সের উপর সোহানাকে ধরে। ইয়া, ওরা কথা বলছে। ক্যাপ্টেন
 এবং আরেকজন। সোহানা বললো, 'আমাদের জন্যে ওরা আসেনিক
 মিশিয়ে ড্রিক পাঠাবে।... তারপর সমুদ্রে ফেলে দেবে।'—রানা শুনলো
 ক্যাপ্টেনের নিচু গলার স্বর। ক্যাপ্টেন চায় না ক্রুদের আর কেউ
 একথা জানুক।

সোহানার হাত ধরে নামিয়ে আনলো ও। বললো, 'রেডি।'

সোহানা বললো, 'ওরা দু'ঘণ্টা সময় দিয়েছে আমাদের। রাত
 ন'টার আমাদের পানিতে ফেলা হবে।

রানা কোনো কথা না বলে দ্রুত হাতে দু'টো লাইফ-বেষ্ট তুলে নিল। দু'টোই পরিয়ে দিল সোহানাকে। বললো, 'কিছুতেই CO₂ সিলিন্ডারের রিলিফ-বাটনে চাপ দিও না। পানিতে নামার পর ওটা ছেড়ে দেবে।'—রানা নিজের শোল্ডার-স্ট্রাপে হাত গলালো। এবং স্ট্রাপ এ্যাডজাস্ট করতে করতে পানির খালি ড্রাম দু'টো নিয়ে এলো। বললো, 'এতে কিছু কাপড় নাও। দু'জনেরই কিছু কিছু নেবে। এটাতে এক টিলে দু'পাখী মারা হবে। যদি লাইফ-বেষ্ট কোনভাবে নষ্ট হয় তবে ড্রামে ভাসা যাবে, আর শূকনো কাপড়-চোপড় রাখার ব্যবস্থাও হল।'

রানা ভেটিলেটরের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। না, কেউ কোন কথা বলছে না। বাইরে ঝুটি হচ্ছে। হ্যাঁ, প্রচণ্ড ধারাল ঝুটি, আশীর্বাদের মত।

এবারে রানা জ্যাক এবং কাঠের টুকরো দু'টো নিয়ে এসে লোহার মইয়ের নিচে রাখলো। সোহানার উদ্দেশ্যে বললো, 'রেডি?'

সোহানা মাথা নাড়লো।

রানা মই বেয়ে উপরে উঠে গেল। মইয়ের শেষ তাকে কাঠের টুকরোটা রেখে তার উপর বসালো জ্যাক। উপরে ঢাকনার সঙ্গে অল্প কাঠের টুকরোটা লাগিয়ে জ্যাকের মাঝখানের হাতলে প্যাঁচ কষল। জ্যাকের মাথা ঢাকনার সঙ্গে আটকে গেল। তাকালো সোহানার দিকে। ইশারা করলো সোহানাকে ভেটিলেটরে কান লাগাতে। সোহানা ভেটিলেটরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ইশারায় জানালো, কেউ নেই। রানা প্যাঁচ কষল। জ্যাকের মাথাটা চাপ দিতে লাগলো কাঠের ঢাকনায়। দশ-বারোবার প্যাঁচ কষার পর কাঠের ঢাকনায় একটা মচমচ শব্দ শোনা গেল। শোনা গেল ঝুটির শব্দ আরো দুবার প্যাঁচ দিতে মড়মড় করে ভেঙে গেল ঢাকনার একটা দিক। রানা সোহানার হাতে নামিয়ে দিল জ্যাক, কাঠের টুকরো।

তুলে ফেললো ভাঙা ঢাকনা। হাত দিয়ে ঠুঁচ করে ধরে অপেক্ষা করলো দশ সেকেন্ড। না, কোন গুলির শব্দ শোনা গেল না। খুলে ফেললো ঢাকনা। মাথা বের করলো। তাকিয়ে দেখলো, কেউ কোথাও নেই। প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি হচ্ছে। রানা বেড়িয়ে পড়লো। ইঙ্গিত করলো সোহানাকে। পনেরো সেকেন্ডের ভেতর সোহানা উঠে এল দু'টো ড্রাম সহ। এগিয়ে গেল কুনারের পিছনের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে, নিঃশব্দে। রেলিং-এর পাশে সরে গিয়ে এগিয়ে চললো। তারপর পেল ধরার মত কাছি একটা। ইঙ্গিত করলো সোহানাকে নামতে। সোহানা একটু ইতস্ততঃ করেই একটা ড্রাম নিয়ে নেমে পড়লো। পানিতে সোহানার অবতরণের শব্দ পেয়ে রানাও রুলে পড়লো। পড়লো কালো পানিতে। কেউ ওদের দেখলো না, কেউ পানির শব্দও শুনলো না। কুনারটা অঙ্ককারে এগিয়ে যাচ্ছে, অঙ্ককারের সঙ্গে মিশে। কোন আলো জ্বলে নি ওরা।

প্রচণ্ডভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। রানা ডাকলো, 'সোহানা?'

সোহানার উত্তর পেল না। আবার ডাকলো।

টেব্রুয়ের সঙ্গে এসে আহুড়ে পড়লো সোহানা। রানা ওকে ধরে ফেললো। ও বললো, 'বৃষ্টির ছাঁট বড় লাগছে।'—একটু থেমে দম নিল, 'ওরা যখন জানবে, আমরা পালিয়েছি তখন ফিরে আসবে না?'

'না, অত বোকা ওরা নয়। ওরা ভাববে, আমরা মরবোই।'—রানা বললে, 'তবে আসেনিক থেরে ম্যাসেফিকে মরার চেয়ে লাইফ-বোর্ট পরে মরা অনেক ভাল, কি বল?'

সোহানার পছন্দ হল না কথাটা। বললে, 'এখন কি করবো? সঁাতার কাটবো?'

'সঁাতার কাটবো তো বটেই। কিন্তু কোন্‌দিকে কাটি বলতো?'

রানা জিভ্বেস করলো, ‘এশিয়ার দিকে, না সাউথ-এ্যামেরিকার দিকে?’

‘এসব বাজে কথা না বললেই কি নয়?’ — রেগে গেল সোহানা।

‘আমি একটু ক্ষুধিত আনার চেষ্টা করছি মনে।’ — রানা বললো, ‘স্রোত ও বাতাস একই দিকে ঝাচ্ছে, এদিকে সঁতার কাটা আমাদের পক্ষে সবচে’ সহজ।’

দু’জন একটু একটু করে এগুত লাগলো। দশ মিনিট সঁতার কেটে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিচ্ছিল। এবং...ধীরে ধীরে ওদের কথা বদল হয়ে এল। ক্রান্তির সঙ্গে ধীরে ধীরে একটা ভয় এসে ওদেরকে গ্রাস করলো।

ঘণ্টা আড়াই এভাবে সঁতার কাটার পর সোহানা বললো, ‘আমি আর পারছি না। পা অবশ হয়ে আসছে।’

রানা ওকে ধরে ফেললো। আধঘণ্টা কেটে গেল। স্রোত ওদের এগিয়ে নিচ্ছিল। বষ্টির ছাঁট কিছুটা কমে এসেছে ততক্ষণে। হঠাৎ রানা চিৎকার করে উঠলো, ‘সোহানা! মাটি!’

সোহানা পা নামিয়ে দিল।

ওরা দু’জন চার ফুট পানিতে দাঁড়িয়ে। সোহানা বললো, ‘নিশ্চয়ই কোন দীপ।’

কিন্তু ওরা কিছুই দেখতে পেল না। অন্ধকার হাতড়ে এগুত লাগলো। উঠে এলো ডাঙার।

রানা ভ্রাম দু’টো টেনে তুললো। সোহানা বসে পড়লো মাটিতে তারপর কাত হয়ে শূন্যে পড়লো। রানা বসলো না, বললো, ‘আমি পাঁচ মিনিটে আশপাশটা দেখে আসছি।’ — অন্ধকারে এগিয়ে গেল। সোহানা চোখ বুঁজলো। কিছুই ত ভাবতে পারছে না।

পাঁচ মিনিট নয়, রানা ফিরে এল দু’মিনিটের মধ্যেই। কারণ

দশ পা বেতেই আবার নামতে হয়েছে পানিতে। রানা সোহানার সামনে দাঁড়াল, বললো, 'এটা কোন বীপ না। সমুদ্রের মাঝখানে জেসে ওঠা একটা পাথর মাত্র।'

সোহানা কোন উত্তর দিল না। রানা বললো, 'কোরাল রীফ, প্রবালের একটা চাঁই। যা হোক, আমরা বেঁচে আছি।'

'হ্যাঁ'।—সোহানা হুকঠে উত্তর দিল, 'বেঁচে আছি অথচ এখনো আমি ভাবতে পারছি না। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আমাদের বৃত্ত্য হয়ে গেছে। এ বেঁচে থাকটা বড় বেমানান লাগছে— পুরোপুরি অ্যান্টি-ক্রাইমেন্স। এটা সত্যি বলে আমি মনে করতে পারছি না।'

রানা বুঝলো, এ মেয়ের কাব্য জেগেছে। ওকে বেশি না ঘাঁটানোই ভালো। পানির ড্রামের গানে হেলান দিয়ে বললো সোহানার পাশ বেঁধে। শিউরে উঠলো রানা। উপরে এই রুষ্টি, নিচে কোরালের খোঁচা খেয়ে রাত কি ভাবে কাটবে? সোহান রানার একটা হাত ধরে চোখ বুঁজে আছে। রানা ওর চেহারা না দেখেও অনুমান করতে পারলো, মেয়েটি ইন্টারকনের সঁতারের মেডেলগুলোর কথা নিশ্চয়ই ভাবছে না, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

এমন রাত, এমন বিগ্রী এবং বড় রাত রানার জীবনে আর এসেছে বলে মনে করতে পারলো না। সোহানা না ঘুমালেও কোন সাড়া-শব্দ-করছে না।

রানা পুরো ঘটনাগুলো শুধিয়ে ভাবার চেষ্টা করলো। চেষ্টা করলো কয়েকটা প্রশ্ন মনে মনে তৈরী করে উত্তর খোঁজার : ১। ক্যান্টেন দিউ কার জন্তে কাজ করছে? ২। কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? ৩। কেন দিউ তাকে 'পরিত্যক্ত' হবার সম্ভাবনার কথা জানালো? ৪। কেন রেডিওতে নির্দেশ পাবার সময়টা বললো? ৫। তাদের সমুদ্রে ফেলা হবে জেনেও এই কোরাল-রীফের কাছ দিয়ে কুনায় পাস

করালো কেন? ৬। কেন রেডিও-রুমের সামনে ভেটিলেটরের মুখ
পিছন দিকে ঘোরানো ছিল? ৭। ক্যাপ্টেন দিউ বিধায় ভুগছে কেন?
কিসের বিধা?

রানার মনে প্রশ্নগুলো ঘুরে ফিরে বাজাতে লাগলো। হঠাৎ থেমে
গেল এক সময়। সমুদ্রের বাতাস আর ঢেউয়ের শব্দ রানাকে প্রশ্ন-
গুলো ভুলিয়ে দিল। চোখে দুনিয়ার ক্রান্তি এসে ভর করলো। ঘুরে-
আগে আবছা অনুভব করলো, মানুষের উপস্থিতি, আলোর সংকেত।
ঘুরে সে অচেতন হয়ে পড়লো।

সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় ঘুম ভাঙলো রানার। না সূর্য নয়,
চোখ মেলেই রানা দেখলো দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।
সোহানাও ঘুম ভেঙে উঠে বসে কি বলতে গিয়ে থেমে গেল, চোখ
বিস্ফারিত হল অন্ধ লোকের উপস্থিতিতে।

এরা কারা?

আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। একসার ঢিবির মত সাজানো
রয়েছে কোরাল নীল সমুদ্রে। চমৎকার সবুজ, হলুদ, বেগুনি এবং
সাদার অপরূপ লাগছে দেখতে। কোরাল বেটিনী একটা লেগুন স্রষ্টা
করেছে। গভীর নীল রঙ লেগুনের। অত্ৰদিকে অস্তুত আকারের দ্বীপ
চোখে পড়লো একটা। এটা ব্র ক্বেটের মত লেগুনকে অত্ৰদিক দিয়ে
বেটিন করেছ। এর উত্তর দিকটা সমুদ্র-সমতল থেকে ঝাড়া উঠে গেছে
উপরে। পূর্ব-দক্ষিণ দিকটা সমুদ্রের সঙ্গে এসে মিশেছে। দ্বীপটি লম্বায়
মাইলকয়েক হবে। উত্তর দিকের নীল পাহাড়ের শৃঙ্গে সূর্যের আলো
পড়েছে। নিচের দিকে নারকেল গাছের সারি।

লোক দু'টো নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করলো। ওরা এসেছে
একটা ডেলার করে। সোহানাকে রানা চীনা ভাষায় কথা বলতে
নিষেধ করলো। জিজ্ঞেস করলো, ওদের কথা বুঝতে পারে কি না।

সোহানা বললো, ‘এরা চীনাই বলছে, কিন্তু অন্য ধরনের । ওরা ওদেরকে নিভেই এসেছে । কেউ ওদের পাঠিয়েছে ।’

সঙ্গে সঙ্গে রানার মনে হল, এরা এত দ্রুত খবর পেল কি করে ? জেলে বলে তো এদের মনে হচ্ছে না ।

পানির ড্রাম দু’টো কাঁধে নিল লোক দু’টো । রানা সোহানার হাত ধরে গিয়ে উঠলো ওদের ভেলাতে ।

আধঘণ্টা লাগলো লেগুন পার হয়ে তীরে পৌঁছতে । লোক দু’টোকে চেহারা দেখে সলেহজুনক বলে মনে হয় না । সাধারণ পসিনেশীয়ান বীপের লোকদের মতই দেখতে । তীরের কাছে এসে রানা দেখলো নারকেল আর অপরিচিত গাছের ছায়ায় ছোট একটা জন-বসতি । ভেলা এসে থামলো অনেক নারকেলের শুড়ি ভানিয়ে তৈরী জেটিতে । নেমে এল ওরা । সোহানা রানার কাছ ঘেঁষে আছে । ওর চোখ অধিক হয়ে দেখছে চারদিক । লোক দু’টো ওদের ইশারা করলো অনুসরণ করার জন্যে । এগিয়ে চললো ওরা লোক দু’টোর পিছনে পিছনে বালির বেলাভূমি ধরে ।...রানা এবং সোহানা থমকে দাঁড়ালো ।

একজন নর খেতাজ সূর্যের আলোতে শূয়ে আছে একা । ওদেরকে দেখে উঠে দাঁড়ালো কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে । লোকটার মাথায় সোনালী চুল । মিউটনি অন বাউন্টির ক্যাপ্টেন ফ্রেচার এখানে এল কি করে !

লোক দু’টো এগিয়ে গিয়ে সোনালী চুলের ফ্রেচারের সঙ্গে কথা বললো । কি কথা, ওরা শুনতে পেল না । দেখলো, সাহেব চলে গেল । নারকেল গাছের ছায়ায় ঘেরা একটা ছাউনিতে অদৃশ্য হল । সোহানা বললো, ‘সাহেব এখানে কেন ?’

‘আমরা এখানে কেন ?’—রানা বললো, ‘আমরা ঘরকুনো বাঙ্গালী হয়ে চলে আসতে পারলাম, আর সাহেব পারবে না ?’

‘সাহেবটা কিন্তু আমাদের দেখে খুশী হয় নি।’—সোহানার চিন্তিত কণ্ঠ, ‘অথচ ওর সাহায্য ছাড়া আমরা বিপদে পড়বো।’—তাকালো সোহানা নেটভ লোক দু’টোর দিকে। দেখলো, কেউ নেই। ওরা চলে গেছে।

এমন সময় সাহেবকে দেখা গেল আবার। লাল-হলদে ফুল-পাতা শাট’ এবং পাছামা পরেছে। মাথায় পানামা টুপি। এগিয়ে এল ওদের দিকে। সোহানা দেখলো, সাদা দাঁড়িতে ঢাকা মুখ, কেমন যেন একটু খামখেয়ালী হাঁটার ভঙ্গি। এসে ইংরেজীতে বললো, ‘আপনারা কোথেকে এলেন? বেড়াতে? আসুন, আসুন—নিশ্চয়ই একটা এ্যাডভেঞ্চারের গল্প শোনা যাবে।’—সাহেব কোন সম্ভাষণ ছাড়াই কথা বলতে শুরু করলো। এবং হঠাৎ থেমে কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললো, ‘অন্ত কোন মতলব নেই তো?’

‘মতলব?’—রানা অবাক হল।

‘সখ, সখের কথা বলছিলাম।’—সাহেব আবার ফিরে চললো। ওরা অনুসরণ করলো তাকে। গিয়ে পৌঁছুলো একটা কাঠের বাড়িতে। ছোট বাড়ি, মাটি থেকে চার ফিট ওপরে নারকেল পাতার ছাউনি দেওয়া কুঠিটা। স্থলর একটা বারান্দা। সাহেব ওদের নিয়ে গেল বসার ঘরে। ঘরটার দেওয়াল দেখা যায় না বইয়ের ভাঙে।

সোহানা দেখলো, দু’একটা এনটিকস এবং আফ্রিকান পুতুল ঘরের একোণে ওকোণে ঘরের সঙ্গে সাজানো। পুরো ঘরে একটা আদিমতার ছাপ। অথচ সুন্দর।

রানা কয়েকটা বাক্যে দ্রুত এখানে আগমনের ঘটনা বলে গেল। ম্যানিলা হোটেল, কিডভাপ, ক্যাপ্টেন দিউ, হত্যার পরিকল্পনা, পলায়ন।

‘বসুন, বসুন। বসে পড়ুন। আপনারা আমার গেস্ট, পরে শুনবো আপনার কথা। প্রথম কফি খান, খুব ক্লাস্তি লাগছে আপনাদের।’ — বলে একটা হিন্দু মন্দিরের মন্দিরার মত একটা ঘণ্টা বেদম জোরে নাড়া দিল। ‘সোহান’ রানা দু’জনই চারদিকে অবাক হয়ে চোখ ফেরাতে লাগলো। দেখলো, বৃদ্ধ ফেপে উঠেছে, মন্দিরা নেড়েই চলেছে। এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়ালো তামাটে রঙের এক নারী। সোরাং জড়ানে কোমরে, বৃকে কাঁচুলী। সারা গায়ের একমাত্র অলঙ্কার— ষোঁবন। মস্ত গায়ের রঙ কালো চোখ, পিঠে ছেড়ে দেওয়া চুল। নাভির অনেক নিচে নামিয়ে পরা ত্রিকোণ কাপড়—সোরাং। রানা স্প্যানীশ গিটারে নারকেল পাতা দোলানো একটা স্বর শুনতে পেল যেন। ‘সোহানা ভাবল, গগ্যার কোন ছবি।

চেষ্টা করে কি যেন বললো স্থানীয় ভাষায়। মেয়েটি চলে গেল পদ’র আড়ালে। বৃদ্ধ বললো, ‘কোচিমা। এখানকার মেয়ে। আমার জন্তে কাজ করতো ওদের পুরো পরিবার।’

রানা উঠে দাঁড়ালো। বললো, ‘আমার নাম মাসুদ রানা, দেশ পাকিস্তান, পেশা বিজ্ঞানী, সলিড ফুয়েল টেকনোলজিস্ট। আর ইনি আমার স্ত্রী, সোহানা মাসুদ।’

রানা বৃদ্ধের বাড়িয়ে ‘দওয়া বিশাল হাতটা হাতের মুঠোয় ধরলো। বৃদ্ধ টুপিটা নামিয়ে হাসলো, ‘ফুয়েল টেকনোলজিস্ট। আর্কিওলজিস্ট না।’ — হাঃ হাঃ করে হাসলো। বললো, ‘আমি হচ্ছি...’

‘আপনি আর্কিওলজিস্ট?’ — সোহানা জিজ্ঞেস করলো। উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললো, ‘আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। আপনি ডক্টর পীয়ের অলিন। প্রফেসর অলিন। সুইডেনের বিশ্ববিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট।

প্রফেসর এবং রানা অবাক হয়ে তাকালো। রানা ভাবলো, মেয়েটি

এখানে এসেই ক্যাটারী শুরু করলো, দেখি ! ডঃ অলিন বিষয়ের সঙ্গেই বললো, 'আমাকে আপনি চিনে ফেললেন দেখছি !'

'কেন চিনবো না !'—সোহানা হাসলো, 'আমাদের দেশের কাগজেও আপনার ছবি বের হয়, লেখা ছাপা হয়। তা ছাড়া বি. বি সি-র টেলিভিশন একটা সিরিজে আপনার লেকচারের উপর প্রোগ্রাম করেছে। ছবিটা আমাদের দেশের টেলিভিশনেও দেখানো হয় বছরখানেক আগে !'

'চমৎকার, চমৎকার !'—ডক্টর অলিন বললো, 'এমন স্মরণী মেয়ের আর্কিওলজিতে ইন্টারেস্ট—বাঃ, চমৎকার ! আপনি কি আর্কিওলজির ছাত্রী ?'

'না ডক্টর, আমি ও বিষয়ে আরো দশজনের মত সাধারণ জ্ঞানই রাখি। তবে আপনার পিটকোরিয়ান আইল্যান্ডের আদি-সভ্যতার উপর লেখা বইটি আমি পড়েছি।'

'চমৎকার, চমৎকার !'—ডক্টর অলিন প্রথমে বিস্মিত তারপর খুশী হয়ে উঠলো। তাকালো রানার দিকে, 'ডক্টর মাহুদ ?'

'আমি ?'—রানা ক্লান্তভাবে হাসলে, 'পিটকোরিয়ান আইল্যান্ডে যাবার বাসনা ছেলেবেলায় হয়েছিল মিউটিনি অন বাউন্টি পড়ে। এবার ভাবছি, আপনার সঙ্গে থেকে কিছু শিখে নেবো পারিবারিক শান্তি বজায় রাখার জন্যে। ও আমার লাইটারের রি ফুয়েলিংও করতে পারে না। দু'জন কথা বলার মত কমন কিছু বের করা প্রয়োজন, কি বলেন ?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয় !'—ডক্টর অলিন উঠে আবার ঘণ্টা বাজাতে লাগলো। কোচিমা প্রবেশ করলো ট্রে হাতে। রানা দেখলো মেয়েটির সোরাং নল, ট্রে উপরে খাবার কি আছে। দেখলো, সোহানাও তাই দেখছে। এ মুহুর্তে অন্ততঃ আমাদের দু'জনের চিন্তাটা কমন, রানা ভাবলো।

ডক্টর বললো, ‘কফি খেয়ে নিন, আপনাদের জন্তে বিশ্রামের ব্যবস্থা করছি।’— বলে বের হয়ে গেল। রানা ট্রে থেকে খাবা দিয়ে তুলে নিল একটা গ্লট। কি খাবার দেখলো না, ভাবলো না। মেনু পছন্দের সময় এখন নয়।

ডঃ অলিন ফিরে এসে বললো, ‘আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ডঃ হুয়াং-এর ঘরে। হুয়াং আমার সহযোগী। পিকিং গেছে বর্তমানে, এখানে ম্যালেরিয়ায় পড়েছিল। ওর ঘরেই সব কিছু ব্যবস্থা করে দেবে ওরা।’

কোচিমা কফি টেলে এগিয়ে দিল। কোচিমাকে দেখলো রানা। মেয়েটির পোষাক এরকম হলেও চেহারায় কোথায় যেন সোফিস্টিকেশন আছে। যেমন এই ঘরটার আদিমতার মধ্যেও এসিডের গন্ধ। শুধু গন্ধটা—হয়তো এদের কোন পানীয় বা কিছু পচে ঠিক বোঝা যায় না। ক্রিদে-পেটে সব কিছুই অন্তরকম লাগে।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে রানা আবার এখানে আসার ঘটনাটা বললো। এবার অলিনকে চিত্তাধিত দেখালো। জোড়া জুতে কুকন দেখা গেল। জিজ্ঞেস করলো, ‘ক্যাপ্টেন দিউ আপনাকে কিডন্যাপ করেছিল নিশ্চয়ই হত্যার উদ্দেশ্যে নয়। পরে মত বদলালো কেন?’—দু’সেকেণ্ড জবাবের জন্তে অপেক্ষা করেই বলে উঠলো, ‘পাগলামী, সব পাগলামী।’— তারপরই আবার হাসলো, ‘এখানে একবার যখন এসে পড়েছেন তখন বেকতে পারছেন না শীঘ্রী। জাহাজ নেই, প্লেন নেই।’

‘কোথাও খবর পাঠাবার মত রেডিও...?’

‘রেডিও?’—হাঃ হাঃ করে হাসলো ডঃ অলিন, ‘রেডিও রিসিভারই ছিল না সারা যীপে। একটাও রেডিও ছিল না। এখন ওয়াং-এর কাছে একটা আছে। সাইক্লোনকে ও বড় ভয় পায়।’

‘ওয়াং কে?’

‘আজ আর নয়।’— ডঃ অলিন উঠে পড়লো, ‘একটা ঘুম দিয়ে উঠুন। কাল সব বলবো। সবার সঙ্গে আলাপ হবে।’

ডক্টর বের হয়ে গেল, কোচিমা এসে দাঁড়ালো সামনে। ওদের ঘর দেখিয়ে দিল।

৪

ঘরে এসে দেখলো, ওদের পানির ড্রাম দু’টো সেই লোক দু’টো আগেই রেখে গেছে। ঘরটা মোটামুটি গোছানো। একটা বিছানা। তাতে পাশাপাশি দু’টো বালিশ সাজিয়ে দিয়ে গেছে।... সোহান ড্রাম থেকে কাপড় বের করলো। রানা বাথরুম থেকে সেফট রেক্সার নিয়ে জানালার কাছে টেবিলটাতে বসলো। সোহানা বাথরুমে ঢুকলো। রানা সেভ করতে করতে ডঃ অলিনের কথা ভাবতে লাগলো। ভাবলো ক্যাপ্টেন দিউকে। ক্যাপ্টেনকে সে যত বুদ্ধিমান মনে করেছিল তারচে’ অনেক বুদ্ধিমান লোক সে আসলে। ডঃ অলিন সম্পর্কে ডিসিশন এখনো নেওয়া যায় না।...রানার ভাবনা শুলিয়ে গেল। দরজা খুলে সোহানা এসে দাঁড়িয়েছে। লাল পেড়ে সাদা শাড়ী পরেছে। হাত-কাটা লাল রাউজ। চুল ছেড়ে দিয়েছে। এবং রানা অবাক হয়ে গেল কপালে লাল টিপ দেবে। লিপস্টিক দিয়ে টিপ পরেছে কিন্তু ঠোঁটে লিপস্টিক লাগায় নি।

সোহানা কোনো কথা বললো না।

রানাও কোনো কথা না বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। কাপড় ছেড়ে মগে করে পানি ঢাললো গায়ে। সারা গায়ে লবন জমে আছে সমুদ্রের পানি শুকিয়ে। বের হয়ে এল শুধু ট্রাউজার্স পরে। শোবার পোষাক আনা হয় নি। রানা ভাবছিল, কোথায় শোবে, একটা সোফা থাকলেও হতো। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলো, সোহানা বিছানার একপাশে সরে শুয়েছে তার জন্তে প্রচুর জায়গা রেখে। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে সোহানা। রানা ওর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো। এবং ঘুমিয়ে পড়ার আগেই ডঃ অলিন সম্পর্কে ডিসিশন নিল—ডক্টর অলিন এক নব্বয়ের মিথ্যাবাদী। ভাবলো, পাশের মেয়েটিকে। পাশাপাশি শুয়ে আছি। অথচ এর মধ্যে দূরত্ব দুই মেকর। দু'জনের মধ্যে দেয়ালটা কিসের? অহংকারের?

কার অহংকার?

রানা, কেন ভেঙে দিচ্ছে না অহংকারের এই প্রাচীর? ঘুমিয়ে পড়লো রানা।

ঘুম ভাঙলো প্চও এক পতনের শব্দে। যেন কোথাও ভূমিকম্প হল। সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। রানা উঠে বসলো। দেখলো, সে মাটিতে বসে আছে। ঘামে ভিজ্ঞে গেছে। দেখলো, সোহানাও ঘুমের ঘোর নিয়েই উঠে বসেছে। বিছানায়। তারপর ঝুঁকে পড়লো এদিকে। বললো, 'তুমি ঘুমের ঘোরে কি সব বলছিলে। তারপর আমি থাক্কা দিতেই পড়ে গেলে।'—সহানুভূতির কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথাও লেগেছে?'

আশ্চর্য হলো রানা। মনে করার চেষ্টা করলো, কি স্বপ্ন দেখছিল। সোহানা আবার জিজ্ঞেস করলো, 'লেগেছে কোথাও?'

'লেগেছে।'—রানা উঠে দাঁড়ালো, 'আমার অহংকারে।'

সোহানার সারা মুখে হাসি ফুটে উঠলো। রাতের বালিশে মুখ ঝুঁজে উপর হয়ে শূয়ে রইল।...খুক খুক হাসির শব্দে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো রানা, সোহানা হাসছে।

বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বললো, 'এই মেয়ে, এত হাসির কি আছে?'

সোহানা বালিশে মুখ রেখেই তাকালো রানার দিকে, 'হাসবো না?'— বললো, 'ঘুমের মধ্যে কি সব স্বপ্ন দেখছিলেন?'

'স্বপ্ন? ঘুমের মধ্যে আমি সব সময় একজনকেই স্বপ্নে দেখি।'—রানা বললো, 'বুড়োকে।'

'না আজ তুমি নিশ্চয়ই কোন মেয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন।'

'বেশ দেখছিলাম, তাতে কি হয়েছে?'

'কিছু হয় নি।'—সোহানা অদ্ভুতভাবে প্রশ্নটা করে ব্দু হাসতে লাগলো, 'মেয়েটার নাম আমি জেনে গেছি।'

'জেনে গেছো।'—রানা এবার রীতিমত বিপাকে পড়লো, 'কি নাম?'

'বলা যাবে না।'

রানা বসে পড়লো বিছানায়। সোহানা তারচেয়ে দ্রুত উঠে বসলো। আঁচলটা কাঁধে তলে দিয়ে ওপাশ দিয়ে নেমে জানালার দাঁড়ালো। মুখে ব্দু রহস্যময়ী হাসি।

দরজায় সেই মুহূর্তে নক হল।

রানা একটা শাটের হাতার ভিতরে হাত গলিয়ে দিয়ে দরজা খুলে দিল। দেখলো, সামনে দাঁড়িয়ে ডঃ অলিন। ডঃ বললো, 'ক্ষিদে পেয়েছে?'—রানা স্বীকৃতি জানালো সহদয় চিন্তে।

খাবার পর অলিনের সেই বসার ঘরে এসে বসলো রানা। ডক্টর

বের করলো চাইনিজ ব্রাণ্ডির একটা বোতল। ঢাললো দু'টো গ্লাসে।
সোহানা কমা প্রার্থনা করে উঠে ঘরটা দেখতে লাগলো। হাড়,
সামুদ্রিক কিনুক, পাথর, ফসিলের কালেকশনগুলো মনোযোগ দিয়ে
দেখতে লাগলো। রানা প্রয়োজনীয় কতকগুলো কথা জিজ্ঞেস করলো।
দীপট আসলে কি, কোথায় এবং কারা এর অধিকারী।

দীপট কমিউনিষ্ট চায়নার এলাকায়। লোক বসতি খুবই সামান্য।
তাও এখন প্রায় নেই—টাইফুনের ভয়ে সবাই কেটে পড়েছে। ডক্টর
উঠে গিয়ে 'স্যাটার-ডে রিভিউ'-এর কয়েকটা বহু পুরানো সংখ্যা নিয়ে
এল। বের করলে একটা লেখা। এগিয়ে দিল রানার দিকে। রানা
দেখলে, একটু প্রবন্ধ। নাম: 'গ্রেটা আইল্যান্ড', লেখক ডঃ পীয়ের
অলিন।

রানা তাকালো ডক্টরের দিকে। জিজ্ঞেস করলো, 'এ দীপের নাম
গ্রেটা?'

'গ্রেটা আমার মেয়ের নাম। এটা পনেরো বছর আগের লেখা
প্রবন্ধ। তখন কোন নাম ছিল না এ দীপের। আমি তখন পলি-
নেশীয় দীপগুলো সম্পর্কে রিসার্চ শেষ করে বাড়িলাম ভারতে। পথে
জাহাজ ঝড়ে পড়ে এখানে পৌঁছে। এখানে তখন কেউই থাকতো
না। আমাকে থাকতে হয়েছিল সাতমাস। এখান থেকে ফিরে
গিয়ে এটা লিখি। এবং আবার ফিরে আসি সাত বছর পর। এসে
খনন কাজ শুরু করি।'

'এতটুকু দীপে আট বছর ধরে খনন কাজ চালাচ্ছেন!'—রানা কথা
বলতে বলতে প্রবন্ধের সঙ্গে দীপের ম্যাপটা দেখে নিল। ৪৪° পূর্ব-
দ্রাঘিমা এবং কর্কট ক্রান্তির কাছাকাছি এ জায়গাটা। ডক্টর আরেকটা
পেপার কাটিং এগিয়ে দিল, প্যারিসের বিখ্যাত 'প্যারিস মাচ' পত্রিকা।
এতে অনেকগুলো ছবি ছাপা হয়েছে ডক্টর অলিন এবং তার সহকারি

হুয়াং-চীং। হুয়াং-চীং চেহারাটা ভাল করে লক্ষ্য করলো রানা।
চাইনিজরা এত লম্বা হয় ? লোকটা সিন্ধু-ফিটার ডক্টর অলিনের থেকেও
লম্বা। সচিত্র আলোচনা। আলোচনা নেই বললেই চলে। ডক্টর
অলিনের কোটেশন ছাপা হয়েছে—‘গ্রেটা আইল্যান্ডের সভ্যতা, প্রিমিটিভ
সভ্যতার আধুনিক রূপ।’

ডক্টরের কথায় কান দিল রানা। ‘এ দীপের নাম গ্রেটাই রয়েছে।’—
ডক্টর বললো, ‘আকিওলজিস্টরা এ নামেই ডাকে। তবে এর বর্তমান
সরকারী নাম ‘হো’। চেয়ারম্যান হো-র নাম থেকে দিয়েছে এ নাম।’

‘পিপ্লস্ রি-পাবলিক অব চায়নার কমিউনিস্ট সরকার আপনাকে
উপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারী বা কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে নি?’—
রানা জিজ্ঞেস করলো।

‘না।’—হাসলো ডঃ। ‘ওদের সরকারী কোন দপ্তর এখানে এখনো
বসে নি। ছোট দীপ। মাত্র শ’খানেক লোকের বাস। তাছাড়া
আগে থেকেই আমি এখানে কাজ করছি...ওরা কোন বাধা দেয়নি
বরং আমার লেখার অনুবাদ করে পৃথিবীর সব ভাষায় প্রকাশিত চায়না
পিকটোরিয়ালে ছাপা হয়। ওদের ভয়ের কোন কারণ নেই, তবে
আমি ভয় পাই গুপ্তচরদের।’

‘গুপ্তচরদের ?’—রানা সোজা হয়ে বললো।

‘হ্যাঁ, গুপ্তচর।’—ডঃ অলিন বললো, ‘আগে, তখনও চীনারা এখানে
আসে নি—আমেরিকার এক সৌখিন বড়লোক আকিওলজিস্ট গুপ্তচর
পাঠিয়েছিল।’—উত্তেজিত হয়ে উঠলো ডক্টর, ‘ওদের বিশ্বাস করবেন
না। টাকা থাকলেই কি সব করা যায় ? আকিওলজি যেন সখঃ
আমি একে সোজা ভাগিয়ে দিয়েছিলাম। সখ চলবে না।’

‘বুঝতে পারছি ডক্টর।’

‘এখন পিকিং সরকার আমাকে সাহায্য করে। আরো করবে

প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ওদের কেউ আসছে না অনেকদিন হল। ওরা এখানে আর কাউকে আর্কিওলজিক্যাল রিসার্চ করতে দেবে না।’—ডক্টর অলিন একগাল হাসলো, ‘আমি আপনাদের সন্দেহ করছিলাম’—ওপুচর বলে। ভেবেছিলাম, সৌখিন আর্কিওলজিস্ট!’

‘এখন তো আর কোন সন্দেহ নেই?’—রানা বললো।

‘না, নেই।’—উঠে দাঁড়ালো ডক্টর। বললো, ‘সেটা প্রমাণের জন্যে আপনাদের দু’জনকে আমার খনন-কাজ দেখাবো—চলুন। মিসেস মাসুদের তো নিশ্চয়ই ইন্টারেস্ট আছে?’

বাইরে বেরিয়ে এসে ডক্টর অলিন হাতের মালিকা ছড়িটা তুলে দেখালো একটা কুটির মাথা। বললো, ‘ওখানে থাকে আমার ওভারশিয়ার ওয়াং। চাইনিজ। একেবারে কুবলা খানের বংশধর। খাটিয়ে লোক।...—পাশের ঘরটা আমার গেস্ট হাউস। তার পাশের লম্বা ঘরটা দেখছেন, ওটাতে থাকে আমার লোকেরা—ডিগার। তার পাশে কয়েক ঘর লোক থাকে—বসতি।’

‘ডক্টর,’—পাশ থেকে জিজ্ঞেস করলো সোহানা ‘ওটা কি?’

রানা দেখলো, লোহার তৈরী মাসুলের মত কি যেন দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের পাদদেশে। কয়েক শো গজ দূরেই।

‘ওটা হচ্ছে...’—ডক্টর অলিন একটা মজার বিষয় পাওয়া গেল। এমনভাবে বলতে লাগলো, ‘কমিউনিষ্ট চায়নার ফেলে যাওয়া জিনিস। এখানে ওদের ফসফেটের ছোট-খাট একটা প্র্যান্ট ছিল। ওটা ক্রাশিং মিল। ওর পাশে যে শেডটা দেখছেন ওটা হচ্ছে ড্রাইং প্র্যান্ট।’—ডক্টর তার হাতের ছড়িটা অর্ধ-বৃত্তাকারে ঘুরালো, ‘প্রায় বছরখানেক...না, মাস দশেক হল ওরা চলে গেছে।...এখানে পাহাড়

কোটে প্রচুর লাইম-স্টোন বের করেছে। জিওলজি সম্পর্কে কিছু জ্ঞানেন?’—ডক্টর অলিন সোহানাকে জিজ্ঞেস করলো। রানার ধারণা হল, ডক্টরের সাধারণ লোকের সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ আছে। সোহানা মাথা নাড়লো, সে কিছু জানে না। ‘তা’ বটে। আজকাল লোকে নিজের বিষয় ছাড়া আর কিছু সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখে না।’—দুঃখিত কঠে বললো ডক্টর অলিন, ‘এ দ্বীপটা সমুদ্রের নিচে ছিল। আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ বা অন্য কোন কারণে কয়েক লক্ষ বছর আগে ভূ-গর্ভস্থ লাভা বের হয়ে আসে, এবং সমুদ্রের নিচে, অন্ততঃ ১২০ ফিট নিচে পাহাড়ের সৃষ্টি হয়।’

‘এটা যে কয়েক লক্ষ বছর আগে ঘটেছে, এটা কি করে ধারণা করছেন?’—সোহানা জিজ্ঞেস করলো।

‘কারণ এটা প্রবাল দ্বীপ, কোরাল আইল্যান্ড।’—ডক্টরের কঠে উৎসাহ, ‘বেশব সামুদ্রিক কীটের সাহায্যে এসব দ্বীপ তৈরী হয় সে কীট সামুদ্রিক প্রাণী হলেও একশো কুড়ি ফিট পানির নিচে বাঁচতে পারে না। তারপর আরো কয়েক হাজার বছর পর...’

রানা ডক্টর এবং সোহানার থেকে একটু দূরত্ব রেখে হাঁটছিল। এবং পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। এখান থেকে ক্রাশিং মিলের দূরত্ব তিন চারশো গজ। পাহাড়টা এখানে কেটে তাকের মত বানানো হয়েছে। পাশে খাড়া পাহাড়, গায়ে একটা স্কেল। স্কেল থেকে বের হয়ে এসেছে একটা ন্যারো-গেজ রেল-লাইন। বের হয়ে খাড়া পাহাড়ের ধার ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে একটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। স্কেল-মুখে দু’টো ছোট টিনচোলা দেখা গেল। ওর একটা ঘর থেকে গুমগুম শব্দ ভেসে আসছে। কোনো পেট্রোল চালিত জেনারেটরের শব্দ। ওহার ভেতরে আলো এবং ডেনটেশনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিসিটি তৈরী হচ্ছে।

‘এই আমরা এসে গেছি।’—পিছন থেকে ডক্টর বললো, ‘এইখানে সিমেন্ট কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়াররা পাহাড়ে অঙ্কুত ধরনের স্তর আবিষ্কার করে। এবং পাহাড়টা কেটে মৌচাকের মত বানিয়ে ফেলেছে।’ একদিন ওর, বাবার আগে আগে পেয়ে যায় কিছু অঙ্কুত ধরনের পাথর এবং পটারীর কাজ। ওরা আমাকে দেখায়। ওরা চলে গেলে আমি কাজ শুরু করি—পিকিং গভর্নমেন্ট আমাকে সাহায্য করে অনুমতি দিয়ে।’

ডক্টরের সঙ্গে ওরা এগিয়ে যায় গুহা-মুখে। ভেতরে ঢুকে পড়লো তিনজন। প্যাসেজটা পার হতেই রানা দেখতে পেল, তারা এসে দাঁড়িয়েছে একটা বিশাল গুহার। চল্লিশ ফুট উঁচু, ঘের হবে দু’শো ফিটের মত। কতকগুলো পিলারের ঠেকনা। ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে টিমটিম করে এক ডজন। খুসর বর্ণের পাথর—একটা ভৌতিক অনুভূতি গা-কাটা দেয়। চারিদিকে আরো পাঁচটি স্বড়ঙ্গ মুখ হাঁ করে আছে। প্রত্যেক স্বড়ঙ্গ থেকে রেল লাইন বেরিয়ে এসেছে।

ডক্টর বললো, ‘এই পাহাড় কাটার মধ্যে প্রচুর দক্ষতা দেখানো হয়েছে, ডক্টর মাসুদ। এখানকার পাহাড়গুলো এভাবেই কাটা হয়েছে। প্রত্যেকটা গুহা স্বড়ঙ্গ দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এই সিস্টেমকে বল হয় ‘হেজাগোনাল সিস্টেম’। এতে সুবিধা হচ্ছে, উপরের কঠিন রাস্টিক লাভার স্তর কাটতে হয় নি।’ ডক্টর অগ্নি এগিয়ে গেল গুহার মাকখান দিয়ে সোজা উর্গো দিকের স্বড়ঙ্গ-মুখে। রেল লাইনের স্লিপার ধরে এগিয়ে গেলো ওরা। অন্ধকারে সোহানা রানার পাশে পাশে চলছে। রানা ওর হাত ধরলো। বিশ গজ হাঁটার পর ওরা অন্ধ গুহায় এল। এ গুহাটা প্রথম গুহার কার্বন-কপি। উচ্চতা, চারপাশের ঘের, স্বড়ঙ্গ এক সমান। তবে এখানে আলো খুব কম। রানার চোখ বাঁ দিকের দু’টো স্বড়ঙ্গ-মুখে

‘আটকে গেল। মুখ দু’টো বিশাল কাঠের বিমের সাহায্যে আটকে দেওয়া হয়েছে।

রানা জিজ্ঞেস করলো, ‘ডক্টর’ ও দু’টো অড্ড-মুখে কি হয়েছে?’

‘ওটা...’—প্রফেসর বললো, ‘ওপাশের দু’টো ওয়ার ভাঙ্গন ধরেছিল। ভাঙ্গন যাতে এদিকে না আসতে পারে সে জন্তে আগেই সাবধান হয়েছিল ফসফেট কোম্পানীর লোকেরা। আমি এভাবেই পেয়েছি ওটাকে। আমার ধারণা, ও ওয়ার ভেতরে বেশ কয়েকজন মাহিনার আটকা পড়ে মারা গেছে। দুঃখজনক ঘটনা। এ কাজে কত লোক যে জীবন দেয়।’—ডক্টর ক্রত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল একটা খোদিত দেয়ালের সামনে। বললো, ‘দেখুন, মিসেস মাসুদ, আমার আবিষ্কার। আমি মনে করি, এই যে দেখছেন একটা পাথরের হামাম-দিস্তা—এটা দিয়ে প্রমাণ করবো গ্রেট আইল্যান্ডের সভ্যত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম সভ্যতা।’—বুদ্ধ আরেক দেয়ালে এগিয়ে গেল। বললো, ‘এখান থেকেই বের করেছি পৃথিবীর প্রাচীনতম কাঠের ঘরের নমুনা।’—বুদ্ধের পকেট থেকে একটা টচ’ লাইট বেরুল। আলোতে খোদিত দেয়াল, দেখা গেল। রানা জিজ্ঞেস করলো, ‘আমরা কত ফুট, মানে, কতটা ভেতরে এখন?’

‘একশো।’—বুদ্ধ বললো, ‘হ্যাঁ, একশো বিশ ফিট গভীরে আছি এখন।’

রানা হাসলো, ‘আমার আশ্চর্য লাগে আপনাদেরকে দেখে, কিভাবে খুঁড়ে উদ্ধার করলেন অতীতকে! আমার মনে হয়, আপনার এ খনন গভীরতম খনন—রেকর্ড খনন বলা যায়?’

‘না, না।’—প্রতিবাদ করলো ডক্টর, ‘নীল ভ্যালীতে এরচে’ গভীরে গেছে ওরা। চলুন ওয়াং কোথায় আছে দেখা যাক।’

ডক্টর এগিয়ে চললো তৃতীয় ওহা পার হয়ে এগিয়ে আলোকিত

সুড়ঙ্গের দিকে। সুড়ঙ্গের ভেতরে কাজ হচ্ছে। চতুর্থ ওহা-মুখে কাজ করছে ন'জন লোক। ওদের হাতে ছোট আকারের গাইতি, একভাবে দেয়াল থেকে কেটে কেটে আনছে লাইম-স্টোনের টুকরো—এবং বিশালদেহী একটা লোক-সেঙলো পরীক্ষা করছে টচের কড়া আলোতে।

কর্মীদের সবাই চাইনিজ। অথচ আকারে সবাই বিশাল, বিশেষ করে দলপতি। দলপতির পরনে শুধু একটা ফুসপ্যান্ট। সুল্লর স্বাস্থ্য, ঘামে চকচক করছে মাংসপেশী। রানাদের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ও, এবং এগিয়ে এল। লোকটাকে দেখলে মনে হয়, এরা বুঝি এখনই পাথর কেটে বের করেছে ওকে। মুখটাকে ঠিক মত কাটতে পারেনি। কোথাও কোথাও অতিরিক্ত পাথর রয়ে গেছে।

বন্ধ পরিচয় করিয়ে দিল রানাদের, 'ওভারশিয়র ওয়াং।'

হাত বাড়িয়ে দিল ওয়াং। বললে, 'খুবই খুশী হলাম পরিচিত হয়ে।'—ভারী কণ্ঠস্বর। ছোট চোখে তাকালো সোহানার দিকে। সোহানা ভাবলো, খুশী হয়েছে লোকটা—যেমন খুশী হত আফ্রিকার ক্যানিবালা আদবাসীরা এক'শো বছর আগে ইউরোপীয়দের দেখে। সোহানার দিকে হাত বাড়ালো না। শুধু মাথা নিচু করলো। বললো ভাঙা ইংরেজীতে, 'আপনাদের কথা আজ সকালে শুনেছি। সত্যি দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু আমরা খুশি হয়েছি আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে।'।

'আপনার লোকেরা সব চাইনিজ। স্থানীয় লোকেরা বুঝি কাজ বোঝে না?'

'না, না। তা নয়।'—প্রতিবাদ করলো ডক্টর অলিন, 'পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্মী জাতি হচ্ছে চাইনিজরা'। পাক-ভারতীয়রা, কিছু মনে করবেন না, অসহযোগী, সন্দেহবাতিকগ্নস্ত, তর্কপ্রিয় এবং স্বাস্থ্য তেমন

ভালো না; স্থানীয় লোকদের স্বাস্থ্য আছে কিন্তু অতিরিক্ত আলসে—
ইউরোপীয়রা লোফার। চাইনিজরা হচ্ছে গিয়ে—আপনি কি খুঁজছেন,
মিসেস মাহুদ ?’

একটু এগিয়ে গিয়ে পাথর কাটা দেখছিল মোহানা। ডক্টরের
ভাকে ফিরে তাকালো। হেসে বললো, ‘দেখছিলাম, আজকে কি
পেলেন।’

‘আজ কিছু পাওয়া যায় নি মনে হয়। রোজই কি আর পাওয়া
যায়।’

‘মাসে একটা কিছু পাওয়া গেলে আমাদের সৌভাগ্য মনে করি।’
—বললো ওয়াং।

‘ঠিক আছে, ওয়াং তুমি কাজ কর, তোমাকে আর ডিস্টার্ব করবো
না।’—ডক্টর বললো, ‘কিছু একটা যেদিন পাবে, এঁদের দু’জনকে
নিশ্চয় আসবে।’

ডক্টরের পিছনে পিছনে বেরিয়ে এল ওরা শেষ বিকেলের আলোয়।
ডক্টর অলিনের কুঠিতে পৌঁছুতেই দু’জন স্থানীয় লোক দৌড়ে এল।
স্থানীয় ভাষায় কি যেন বললো। ডক্টর বললো, ‘আপনাদের জন্মে
গেস্ট-হাউসটা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। ওখানে বেশ সুবিধা হবে
আপনাদের।’

সোজা গেস্ট-হাউসে উঠলো রানা ও মোহানা। ওদের জিনিস-
পত্রগুলো নিয়ে আসা হয়েছে, বিছানার ব্যবস্থা হয়েছে। খাটটা
একটু বড়। কোচিমা বিছানাটা শুছিয়ে দিচ্ছিল ওরা যখন এল।
ওকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করলো মোহানা, রানা জানালার পর্দা
সরিয়ে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরালো। কোচিমার
সঙ্গে দু’ একটা কথা বললো মোহানা। ও চলে গেলে বললো,
‘মেন্নেটা অভুত।’

‘কেন?’

‘কোন কথার জবাব দিতে চান না।’

সোহানা রানার চিন্তাঘটিত মুখের দিকে তাকিয়ে বিছানায় বসলো। ও কিছু একটা বলতে চান, কোচিমা সম্পর্কে হয়তো আলোচনা করতে চান অথচ রানাকে এত সিরিয়াস দেখে চূপ করে রইলো।

হঠাৎ নীরবতা ভাঙলো রানা। বললো, ‘আমি একটু ঘুরে আসছি।’—বলে বেরিয়ে গেল।

সোহানা জানালার দাঁড়িয়ে দেখলো, ওয়াং তার দল নিয়ে ফিরে আসছে ক্রাশিং মিলের দিক থেকে। সোহানা ভ্রু কুঞ্চিত করলো। ভাবলো, রানা ওভাবে বেরিয়ে গেল কেন? দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই একটা হৈ চৈ শুনলো সোহানা। বেরিয়ে এস বারান্দায়। দেখলো একটা জটলা। একটু পরে দেখলো, ডক্টর এবং ওয়াং-এর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে রানা। সোহানা সিঁড়ির ধাপগুলো বেয়ে নেমে এল দ্রুত। উঁচু করে তুলে নিয়েছে ওয়াং রানাকে। নিয়ে আসছে এদিকে। কি হয়েছে রানার! সোহানার বুক কঁপে গেল। ডক্টর কাছে এসে বললো, ‘কিছু না, ঘাবড়াবেন না, মিসেস মাসুদ। আপনার স্বামী দৌড়ে যেতে গিয়ে একটা গর্তে পা পড়ে পা মচকে গেছে।’

‘মচকে গেছে!...উহ্, উউহ্, নিশ্চয়ই ভেঙে গেছে।’—ককিয়ে উঠলো রানা।

সোহানা দৌড়ে উঠে গেল ঘরে ওদের আগে। বিছানাটা টেনে ঠিক করলো। ওয়াং রানাকে শুইয়ে দিল। রানা চোখ বুঁজে বললে, ‘আহ্, গেলাম!’

ডক্টর বললো, ‘আমি আইওডেক্স ও ব্যাণ্ডেজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। মালিশ করে দিন, মিসেস মাসুদ। এখানে কোনো ডাক্তার নেই,

●
আমি যা বুঝি...

‘আহ, আপনারা বেশী কথা বলবেন না। যা পাঠাবেন পাঠিয়ে দিন। আহ, গেলাম। হাড় একেবারে ঝুঁড়ে হয়ে গেছে।’

সোহানা গিয়ে বসলো রানার পাশে, কপালে হাত রাখলো। রানা হাতটা ধরে চাপ দিল। সোহানা জিজ্ঞেস করলো, ‘রানা, কি করে হলো? কে...? —তাকালো সবার দিকে। ওয়াং পিছিয়ে গেল। উঠে দ্রুত বের হয়ে গেল। সোহানা হাত দিতে গেল পারে, রানা চৈতন্যে উঠলো, ‘হাত দিও না...উহ...?’—সোহানা একটা আঁচড়ের দাগ দেখলো।

একটু পড়ে একটা চাইনিজ ছেলে দৌড়ে দিয়ে গেল আইওডেনের একটা শিশি ও বাথগেজ। রানা বললো, ‘দরজাটা বন্ধ করে দাও।’

সোহানা দরজা বন্ধ করে দিল। রানা চোখ বুঁজে আছে। সোহানা বুকের উপর বুঁকে পড়লো। ওর চোখে-মুখে ভয় ও শঙ্কা ছাপ। রানা চোখ মেলে দেখলো অনন্ত স্তম্ভর মুখটা। কথা বললো না। সোহানা জিজ্ঞেস করলো, ‘কিভাবে হল?’

রানা সোহানার মাথাটা টেনে বুকে নামালো। সোহানাও দু’হাতে জড়িয়ে ধরলো রানাকে অসহায়ভাবে। বললো, ‘কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই একটু বাধ্যতেই এত...।’

রানা ফিফিস করে বললো, ‘ভয় পেয়ে গেছো?’

‘না।’—মাথা নাড়লো সোহানা।

রানা বললো, ‘জানালায় পর্দাটা টেনে দিয়ে এসো তো।’

সোহানা রানার বুক থেকে মাথাটা তুলে জানালার কাছে গেল। টেনে দিল পর্দা। ফিরে আবার এসে বসলো রানার পাশে। রানা আবার ওকে বুকে টেনে নেয় বলে, ‘কি হবে এবার?’

‘কিছু হবে না।’—সোহানা বলে, ‘নিশ্চয়ই খুব বেশি কিছু হয়নি।

সকালেই ভাল হয়ে যাবে। খুব লাগছে ?

‘হঁ...।’

সোহানা উঠতে যায়, পারে না। রানা ধরে আছে ওকে। গভীর তৃপ্তিতে চোখ বুঁজছে। রানার কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিল সোহানা। কান্না পাচ্ছে ওর। কি অসহায় লাগছে রানাকে! কি শান্ত! সোহানা রানার গালে ছোট করে চুমু খায়। ঠোঁটে ঠোঁট বুলায়। রানা চোখ মেলে দেখে সোহানার চোখ ভেজা। রানা হাসে। বলে, ‘কেমন ভয় পাইয়ে দিলাম।’

‘মনে ?’—সোহানা সোজা হয়ে বসে।

‘মানে ?’—রানা বিছানা থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। দিবা একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

সোহানা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রানার কাছে এগিয়ে আসে। রানা দেখে, একটু আগে দেখা স্নান মুখের কমলতরী কোথায় চলে গেল! একি...!

ধরে ফেললো সোহানার হাত চড়টা গালে পড়ার আগেই। রাগে ফেটে পড়লো সোহানা। রানা ওর মুখটা চেপে ধরলো। বললো, ‘কোন কথা নল। সব বলছি। ওরা যেন টের না পায়, আমার কিছু হয় নি! আমাকে অভিনয় করতে হবে...আমি পছন্দ করেছি। পায়ে বড় করে একটা ব্যাণ্ডেজ করে দাও।’—গড়গড় করে বলে গেল রানা, ‘কি বিচ্ছন্ন মেয়ে বাবা! কিছু না শুনেনি...!’

ও শান্ত হয়েছে একটু। মুখটা লাল। চোখে পানি। কঁদে ফেললো সোহানা, ‘তুমি আমাকে কীকি দিয়ে...!’

রানা ওকে পাশে বসিয়ে বললে, ‘তোমাকে কীকি দেবার ইচ্ছে আমার নেই, এটা হলফ করে বলছি। চুমু খেয়েছে’, তা হয়েছেটা কি ?...শোনো, কীকি অবশ্য দেবো তবে চুমুর জন্তে নয়, অত

কারণে। আজ তুমি এখানে খাবার দিতে বলবে। ডক্টর বা ডক্টরের লোক ধোঁজ নিতে এলে বলবে, অবস্থা ভাল নয়। ডক্টরকে বলবে একটা কাচ বা অল্প কিছু জোগাড় করে দিতে পারে কি না? বুঝলে?’

সোহানা হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো রানার মুখের দিকে চোখ মুছতে ভুলে গিয়ে। রানা বললো, ‘আমার কিছু হয় নি—এর জন্তে খুশী হও নি তুমি?’—উত্তর দিল না সোহানা, চোখ মুছলো। রানা বিছানার গা এলিয়ে দিল, সিগারেটে দু’টো টান দিল। বললো, ‘সোহানা, রাতে ঘুমের ঘোরে কি বলেছিলাম—যে, বললে না?’

চমকে তাকালো সোহানা। আবার লাল হয়ে গেছে ওর মুখটা। বললো, ‘বলবো না।’

এ ময়েকে খুশী করার বুদ্ধি পেয়ে গেছে রানা। থাওয়া শেষ হলে ওরা দু’জন আলো নিভিয়ে পাশাপাশি শুষে রইলো অনেকক্ষণ। রাত বাড়লো, চারদিক নির্জন হয়ে এলো। উঠে বসলো রানা। কিন্তু টান পড়লো হাতে। দেখলো, সোহানা ধরে রেখেছে ওর আঙ্গিন। রানা আবার শুষে পড়লো, কাত হয়ে। সোহানা বললো, ‘আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।’

রানা বললো, ‘না, ওরা যদি কেউ এসে পড়ে তোমাকে দু’জনের প্রাণ দিতে হবে।’

সোহানা কিছু না বলে ছেড়ে দিল রানার আঙ্গিন। সোহানা হঠাৎ বললো, ‘তুমি কি ডক্টর অলিনকে সন্দেহ করছো?’

‘বিশ্বাস করি না অন্ততঃ।’—রানা উঠে পড়লো বিছানা থেকে। শার্টটা বদলে গাঢ় কাল রঙের একটা গেজি পরলো। এবং জানালা দিয়ে বের হয়ে পড়লো।

রানার প্রথম অভিযান হবে ডক্টরের ঘরে।

৫

শিকারী বেড়ালের মত নিঃশব্দে অঙ্ককারের সঙ্গে মিশে মিশে ডঃ অলিনের কুঠিতে পৌঁছুলো রানা। টাঁদের আলো, সমুদ্রের বাতাস নারকেল গাছের সারিতে আলো-ছায়ায় ভৌতিক নড়াচড়া, কম্পন এবং শব্দের দীর্ঘশ্বাস।

প্রকৃতিতে নিঃসঙ্গতার ক্রান্তি।

রানা পেছনের দরজটার হাত দিতেই বম্ববম শব্দ করে উঠলো। দরজার কপাট খোলা। ভেতরে বাঁশের জ্বীন। কতকগুলো বাঁশ পাশাপাশী বেঁধে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। খমকে দাঁড়িয়ে গেল ও। শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো পাঁচ মিনিট। কারো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। বসে পড়লো নিচে। আশে আশে এক একট করে বাঁশ হাতের মধ্যে নিয়ে জ্বীনটা নিচ থেকে উপরের দিকে তুলতে লাগলো। কিছুটা তুলেই শরীরটা গলিয়ে দিল ভেতরে। এবং আবার এক এক করে বাঁশগুলো ছেড়ে দিল।

এক মিনিট অপেক্ষা করলো। কারো সাড়া-শব্দ না পেয়ে পেলিল টচের স্নাইচে চাপ দিল। রামাঘর। রামাঘরে আশ্চর্য কিছু

অবিকারের জন্তে আসে নি রানা। কিন্তু এসেছে যার জন্তে তাপে
পেয়ে গেল কাঁটা-ছুরির ভ্রমারে। নানা ধরনের ছুরির ভেতর থেকে
রানা দশ ইঞ্চি লম্বা চকচকে স্পন্দন বাঁটওয়াল ছুরিটা হাতে তুললো।
একদিকে ধারালো, অল্প দিকে করাতের মত। কিন্তু মাথাটা সূচালো।
এতেই চলবে। একটা ভ্রাপকিন তুলে নিল রানা। টেবিল থেকে
ভাতে ছুরিটা জড়ালো। ঝঁজে নিল কোমরের বেটে।

রামাঘরের ভেতর-মুখি দরজার পর একটা সরু প্যাসেজ। অন্ধকার
নারকেলের পাতার পর্দাটা সরিয়ে প্যাসেজটার দাঁড়ালো।
লেখলো, ওপাশের ঘরে আলো। লোকের অস্তিত্ব অনুভব করলো।
ফিরে যাবার কথা ভাবলো। কিন্তু একটা কৌতুহল তাকে এগিয়ে
নিয়ে গেল। থমকে দাঁড়াতে হল তাকে। কোচিমার ঘর। গান
গাইছে কোচিমা। বৃন্দু আলো জ্বলছে ঘরের কোণে। বিছানার এক
কোণে বসে মাথায় একটা ফুল ঝঁজে দিচ্ছে মেয়েটি। ঝন ঝন করে
গান গাইছে থেমে থেমে। বৃন্দু আলোতে দেখতে পেল কোচিমার
নয় কাধ, গ্রীবা এবং স্তন। উপরে কিছু পরেনি তামাটে মেয়েটি।
সূর্যালোকিত দীপের মেয়ের রোদে ধরে রাখা শরীর। উঠে দাঁড়ালো
কোচিমা। পরনে সোরাং নয় অতি আধুনিক স্বচ্ছ লেসের পেটি।
যার বিজ্ঞাপন 'ভোগ' পত্রিকায় দেখা যায়। কোথাও বেরুবে মেয়েটি।

রানা দু'পা সরে যেতে পায় কি একটা লেগে শব্দ হল।
মুহুর্তে শিকারী বেড়ালের পদক্ষেপে লেপ্টে দাঁড়ালো রানা দেয়ালের
এককোণে, অন্ধকারে। বেরিয়ে এল কোচিমা। দাঁড়ালো দরজার
সামনে। কারো উদ্দেশ্যে কিছু বললো। বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটি কারো
প্রতিকার আছে। এবার তার গানে স্বচ্ছ কাপড়ের নাইট। রানা
বাঁ দিকের ভেজানো দরজাটা দেখতে পেল। আরো কিছুটা কোণে
একটা টেবিল, ব্রহ্ম পদে তার নিচে গিয়ে বসলো। কোচিমা এগিয়ে

এলো স্যাণ্ডেলের হিলে শব্দ তুলে, বাতাসে গন্ধ ছড়িয়ে। ভেজানো দরজাটার মুখে দাঁড়িয়ে কারো নাম ধরে ডেকে কি যেন বললো। বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। স্থানীয় ভাষায় ধমকে কি যেন বললো মেয়েটিকে। কোচিমাও কি একটা উত্তর দিল। আরো দু'একটা কথা বলে মেয়েটি চলে গেল তার ঘরে। ছায়ামূর্তি ফলো করলো কোচিমা'কে। রানা দেখলো, ছায়ামূর্তিটি আর কেউ নয়, ডক্টর স্বয়ং। এত রাতে কি করছিল, ডক্টর? তবে কি রানার অনুমান সত্যি? সকালে বসার ঘরে বসে সে সালফিউরিক এসিডের গন্ধ পেয়েছিল। সে গন্ধের কারণটা বের করার জন্তেই আজকের অভিযান।...রানা দু'মিনিট অপেক্ষা করলো। কোচিমা'র ঘর থেকে আর কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। রানা এগিয়ে গেল কোচিমা'র ঘরের সামনে। দেখলো। বিশ্ময়ের সঙ্গে, বন্ধ ডক্টর এবং কোচিমা আদিম হয়ে উঠেছে। ডক্টরের বিশাল শরীরের নিচে নিষ্পেষিত হচ্ছে কোচিমা'র ছোট তামাটে শরীরটা। যদু আলোয় ওদের এই উন্মত্ততা পাশবিক করে তুলেছে ঘরের একটু আগের নীরব মুহূর্ত। কোচিমা'র গোলাপী নাইটি ও পেণ্টি পড়ে আছে কাঠের মেঝেতে। কোচিমা' কে?

রানা সড়ে এসে ভেজানো দরজাটা খুলে ঢুকে পড়লো ডক্টর অলিনের ঘরে।...ডক্টর আবার আসবে, কিন্তু দশ-পনেরো মিনিটের আগে নয়। এ ঘরটাতেই রানা এসে বসেছিল সকালে। বই-এ ঠাসা ঘর। রানা দেখলো, একটা সেল্ফ থেকে কিছু বই নামানো হয়েছে। এগিয়ে গেল সেদিকে। পেল্লিল টর্চের আলো ফেললো বই বের করে নেওয়া আলমারির তাকে। রানা দেখলো, এসিড এক্যুমুলেটর এবং ড্রাই ব্যাটারী। আটটা 2.5 ভোল্টের Exide ব্যাটারী সমান্তরাল তার দিয়ে সংযুক্ত রয়েছে। সালফিউরিক এসিডের উৎস। এ ব্যাটারীর সাহায্যে টাঁদে পর্যন্ত খবর পাঠানো যায় যদি রেডিও-

ট্রান্সমিটার থাকে।

অর্থাৎ যক্ষ ডঃ অলিনের রেডিও-ট্রান্সমিটার আছে। নিচের তাকে পেলিস টর্চের আলো ফেললো রানা। দেখলো, তার অনুমান মিথ্যে নয়। ট্রান্সমিটারের গায়ে লেখা একটা আমেরিকান কোম্পানীর নাম। ডঃ অলিন নিশ্চয়ই আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার ভেত্নে রাখেনি এটা। রানা এবার এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো। কারণ ও বুঝলো, একটু আগেই এটা ব্যবহার করা হয়েছে। রানা রেজিনে বাঁধানো একটা বই হাতে তুলে নিল। বইটার ভাঁজে একটা পেলিস রাখা রয়েছে। পৃষ্ঠাটা মেলে ধরতেই পেজুইন-হিরোশিমা 2300/10430 জাপান গ্যাংক্যানিয়ান 2936/3000 এমনি আরো চারটা অঙ্ক এবং নাম দেখতে পেলো। আরেকটা বই থেকে কাগজ ছিঁড়ে নিলে রানা পুরো কাগজটা কপি করে সেটাকে ভাঁজ করলো এবং পকেটের সিনিয়র সার্ভিসের প্যাকেট থেকে সেলোফেন মোড়ক খসিয়ে কাগজের টুকরোটা জড়ালো। তারপর জুতো খুলে মোজার মধ্যে, ঠিক পায়ের তলে ওটারে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। কোচিমার ঘরের সামনে আসতেই শুনতে পেল নারী কণ্ঠের হাসি। বুঝলো, এখনো ব্যাপ্ত আছে ডক্টর প্রেমে। বেরিয়ে পড়লো রানা রান্নাঘর দিয়ে আগের পথে এবং হামাঙড়ি দিয়ে সমুদ্রের বেলা ধরে এগিয়ে চললো।

দশ মিনিট হামাঙড়ি দিয়ে বসতি পেরিয়ে কিছুদূর আসবার পর উঠে দাঁড়ালো হাঁটু আর হাতের ছড়ে ষাওয়া যন্ত্রণা নিয়ে। দ্রুত পদক্ষেপে এসে পৌঁছুলো পাহাড়ের পাদদেশে, রেল লাইনের উপর। লাইনটা বেরিয়ে এসেছে ক্রাশিং মিল থেকে, চলে গেছে দক্ষিণে, তারপর হয়তো পৌঁছেছে পশ্চিমে। রানাকে পৌঁছুতে হবে এর সমাপ্তিতে। কোথায় গেছে এ লাইন? কারণ জানতে হবে পশ্চিমে

কি আছে এ বীপের। ডঃ অলিন এত কথা বলছে, কিন্তু উল্লেখ করেনি এ বীপের অপর প্রান্তে কি আছে। তাছাড়া ডক্টরের হিসেব অনুসারে ফসফেট কোম্পানী দৈনিক হাজার টন ফসফেট সংগ্রহ করতো। এবং তা বাইরে পাঠাতো। তার জন্তে নিশ্চয়ই প্রয়োজন হতো জাহাজের, বড় আকারের জাহাজের। সে জাহাজ নিঃসন্দেহে ডঃ অলিনের বাড়ির সঙ্গে অল্প পানির লেগনে আসতে পারতো না। জাহাজ বোঝাই করার জন্তে দরকার ক্রেনের, ঘাটের।...রানা এভাবে গিয়ে ভাবলো, ডক্টর তাকে একজন সলিড ফুয়েল টেকনোলজিস্টই মনে করেছেন।

হেলেবেলার কথা মনে পড়লো রানার। এমনি করে রেল লাইন ধরে দৌড়াতে তার ভাল লাগতো। ছুটে চলেছে, আরো দ্রুত করলো গতি। একটু থমকে গেল হঠাৎ, কালভার্ট'। দাঁড়িয়ে পড়লো। পাহাড় থেকে নেমে এসেছে একটা ছোট স্রোত। চলে গেছে সমুদ্রের দিকে। চাঁদের আলোয় চক্চক্ করছে স্রোত।...একি! ভারী একটা কিছু এসে তার পিঠের উপর পড়লো। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রানা।...বাঁ হাতে, কনুইয়ের ঠিক উপরে কিসের ঘেন একটা জান্তব চাপ অনুভব করলো। অনুভব করলো, একটা যন্ত্রণা তার রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

ওয়াং, ওয়াং তাকে তাড়া করে এসেছে। রানার এ কথাটাই প্রথম মনে এল। ওয়াং ছাড়া কারো কল্পিতে এত শক্তি থাকতে পারে না। রানা সমস্ত শক্তিতে ঘুরে দাঁড়াতে গেল, পারলো না। ডান হাতটা মুক্ত করে এক দিকে ঝুঁকে পড়লো। কালভার্টের নিচে স্রোত, পতন থেকে বাঁচবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো রানা। এবং তখনই বুঝলো, এটা ওয়াং নয়, একটা কুকুর।—কুকুরের দাঁত ক্রমেই বসে যাচ্ছে মাংসের ভিতর। রানা ডান হাতে কুকুরের

পেটের দিকে ঘুঁষি মারলো। কিন্তু কুকুরটা বাঁ দিকে এবং পিছনে থাকতে লাগল না ভাল মত। পা চালালো, তাও নাগাল পেল না। কোথাও ওর মাথাটা ঠুকে দিতে পারে তারও উপায় নেই। ঘুরে একে নিয়ে মাটিতে পড়লে কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করা চলে কিন্তু তাতে কুকুরটা সহজেই রানার কঠনালীটা ধরে বসতে পারবে।

নেকড়ে মত জন্তুর ওজন নব্বই পাউণ্ডের মত। ক্ষুরধার দাঁতে রানার মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে। দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল রানা। বাস নিতে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। কয়েকটা শুক যন্ত্রণাকাতর মুহূর্ত কাটলো। রানা এক সঙ্গে স্বত্বার দর্শন এবং নতুন উদ্যম পেল। মনে পড়লো ছুরিটার কথা। ডান হাতে কোমর থেকে খসিয়ে নিল ছুরিটা। শক্ত মুঠোর বাঁটটা ধরে পুরো দশ ইঞ্চি ব্লেড ঢুকিয়ে দিল কুকুরটার বুকের পাজরে। চেপে দিল উপরের দিকে, হার্টের অবস্থানে। এক মুহূর্তে ওর কানড় আলগা হয়ে গেল। কাত হয়ে পড়লো নব্বই পাউণ্ডের শরীরটা কালভার্টের উপর। দু'বার ছটফট করলো গলা লম্বা করে, তারপর আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। রানা বের করে নিল ছুরিটা। কুকুরটাকে পা দিয়ে খাতা মেরে ফেললো পানিতে। এবং নিজেও নোম এল। কুকুরটাকে দেখলো। ছুরির মোড়ক ভ্রাপকিনটা পানিতে ভিজিয়ে বাঁ হাতের রক্ত পরিকার করলো, জড়িয়ে দিল ভেজা ভ্রাপকিনটা। স্বচ্ছ, পরিকার পানি। মাথাটা ডুবিয়ে দিল নিচু হয়ে। এবং হাঁটু পানির ভেতর দিয়েই ওপারে গিয়ে রেল-লাইনে উঠলো। আবার এগিয়ে চললো। শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। রানার ডান হাতে প্রাণপণ শক্তিতে ধরা দশ ইঞ্চি ছুরিট।

ঘীপের দক্ষিণ দিকে পৌঁছে গেল রানা। দেখলো, এদিকটার কোনো গাছ নেই, তবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়। হামাগুড়ি দিয়ে না চললে দূর থেকে দেখা যাবে।

হাতের স্বর্ণা রানাকে হামাঙড়ি দিতে মোটেই উৎসাহিত করছিল না। কিন্তু হঠাৎ চারিদিকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। রানা মাটিতে শূরে পড়লো। আকাশে তাকিয়ে দেখলো, চাঁদের মুখে লেগে থাকা মেঘ সরে গেছে। রানা বুঝলো, এখন হেঁটে চলা মোটেই নিরাপদ নয়। উজ্জ্বল আলোয় পুরো বীপটা স্নান করছে যেন।...রানা বীপটাকে ভাল করে দেখতে লাগলো। নির্জন, একাধী বীপটা এখন তার কাছে অস্বস্তিতে দেখা দিচ্ছে। সকালে বোঝা যায় নি, বীপের এদিকে পাহাড়ের পাদদেশটা এ রকম হবে। সমুদ্রের বাতাস, শব্দ, চাঁদের আলো হাতের স্বর্ণা সবে মিলে অস্বস্তি এক অনুভূতির সৃষ্টি হল...

—আবার ঢেকে দিল মেঘ চাঁদের মুখ। রানা উঠে পড়লো। এগিয়ে চললো হামাঙড়ি দিয়ে।—আবার আলো ফুটে বেরলো। রানা শূরে পড়লো মাটিতে। এবং বিনয়ের সঙ্গে দেখলো, কয়েক হাত দূরেই একটা তারের লাইন মাটি থেকে সামান্য উঁচুতে বসানো। আগে চোখে পড়ে নি কারণ তারটা কালো রঙ করা। প্রথম মনে হল, এটাতে ইলেকট্রিক প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু কুকুরের ছুটে বেড়ানো দেখে বুঝলো, তারে কারেন্ট নেই এটা এক ধরনের ওয়ানিং সিগন্যাল। আর এগিয়ে যাবে কি না ভাবতে গিয়ে দেখতে পেল, কয়েক হাত দূরেই কাঁটা-তারের বেড়া। ছয় ফিট উঁচু মাথা বোরানো সিমেন্টের খামে এক লাইন তার পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে, চলে গেছে সমুদ্রের দিকে। রানা দেখলো, লাইন একটা নয়, দশ ফিট ব্যবধানে আরো এক সারি কাঁটা-তারের বেড়া সামান্তরালভাবে চলে গেছে। রানার চোখ দ্বিতীয় বেড়া দেখছিল না, দেখছিল বেড়ার ওপাশের তিনটি মানুষ মূর্তি। ওরা কথা বলছে। একজন সিগারেট ধরালো। হাসির শব্দ শোনা গেল। তিনজনের কাঁধেই রাইফেল

‘তিনজননের পরনেই নেভীর পোশাক। কারা এরা। ওখানে কি হচ্ছে ?

রানা অবাক হয়ে দেখছিল। এরা কারা ? পোশাক দেখে অন্ধকারে ‘বোকা যাচ্ছে ন’, কোন দেশিও নেভী এরা। তবে কি এই বীপের উদ্দেশ্যেই রানা ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়েছিল ? এ বীপেই কি পাকিস্তানী বৈজ্ঞানিকরা এসেছিল ম্যানিলা থেকে ?

তাহলে, কে এই ডঃ অলিন ? কে এই ওয়াং ? কোচিমা নিঃসন্দেহে আদিবাসীদের কেউ নয়, আধুনিক যুগেরই মেয়ে—তবে কেন সোরাং পরে থাকে ? এখানে রানা হঠাৎ এসে ওঠা কোনো লোক নয়, রানাকে ওরা কিছু লুকোতে চায়। কেন, কিসের স্বার্থ এদের ?

ডঃ অলিনের ঘরের ‘রেডিও-ট্রান্সমিটারই সবচে’ বড় প্রমাণ, সে এসে পড়েছে এক গুপ্তচক্রান্তের ভেতরে।

মানুষের কণ্ঠ শুনে চমকে উঠলো রানা।

অবাক হয়ে আশ-পাশে তাকালো রানা। দেখলে’, ঝোপগুলো নড়ছে। হ্যাঁ নড়ছে, সরে যাচ্ছে। কণ্ঠস্বর ঝোপগুলোর।

রানা বুঝলো, এগুলো আসলে ঝোপ নয়। মানুষ! তার মতই ষ্টিশুটি মেয়ে পড়ে আছে। রানা কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকলো। কপালে ঘাম দেখা দিল। তারপর আন্তে আন্তে দু’এক ইঞ্চি করে পিছোতে লাগলো। একটা খাদের মত দেখে তাতে নেমে পড়লো। আধঘণ্টা সেখানে একভাবে স্থাস বদ্ধ করে পড়ে থাকলো। আধঘণ্টা পরে মাথা তুলে দেখলো, আশ-পাশের ঝোপের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। ঝোপগুলো কোথায় গেল ? আবার হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে চললো রানা।

৬

একটা শব্দে ঘুম ভাঙলো রানার।

কিন্তু ঘুম থেকে উঠে শব্দের কোনো নমুনা পেল না।

ন, বেঁচে আছে সে। জলাতঙ্ক হয় নি। চোখ মেলে তাকালো।
বিছানার পাশে একটা মোড়ায় বসে আছে সোহানা। তার বড়
বড় দু'টো চোখ রানাকেই দেখছে। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কিসের
শব্দ হল?'

'শব্দ?'—সোহানা বললে, 'ডঃ অলিন গুহার কাজ করছেন।'
—রানা আবার চোখ বুঁজলো, আবার তাকালো।

পানির ড্রামে কম কাপড় ধরে নি! পেন্সাজ রঙের একটা শাড়ী
পরেছে সোহানা। নরম চুলগুলো কাঁধে লুটানো। সকালের গোসল
করেছে। সকালের রোদের মত প্রাণবন্ত লাগছে মেয়েটিকে। রানাকে
চোখ মেলেতে দেখে হাসি ফুটলো ওর চোখে। হাসিটা দেখে মনে
হল, গতরাতে প্রতিজ্ঞা করেছে, এই লোকটার সঙ্গে আর বিরোধ
নয়। হাসলো ও কিন্তু কথা বলতে পারলো না। কিসের এক
বিস্ময়তা ঘিরে ফেললো ওকে হঠাৎ। রানাই বললো, 'ব্যাঃ, খুব

‘স্নান লাগছে।’

‘কি?’

‘সকালটা।’—বলে জানালার দিকে ইশারা করলো। মনে মনে হাসলো।

‘ও, ইয়া।’—জানালার দিকে বাইরে তাকালো। সোহানা। বললো, ‘স্নান, কিন্তু এখন সকাল নয়, দুপুর।’—বলেই জিজ্ঞেস করল, ‘কখন ফিরেছিলে?’

‘ভোর রাতে।’

‘ভোর রাতে! কি করলে সারারাত?’

‘অনেক কিছু, সব বলবো।’—রানা বললো, ‘আগে খেতে দাও, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।’—রানা উঠে বসলো। সোহানা ঘরের কোণ থেকে এক জোড়া ক্রাচ নিয়ে এল। বললো, ‘ডক্টর অর্লিন সকালে দিয়ে গেছেন।’

রানা ক্রাচটা বগলে লাগিয়ে তার উপর ঝুঁকে পরেই ব্যাথার কাবরে উঠলো। সোহানা ছুটে এসে ক্রাচ ধরলো, ‘কি হয়েছে?’

রানা শাটের বোতাম খুলে বাঁ হাতটা বের করলো। সোহানা ব্যাণ্ডেজটো দেখে খতমত খেয়ে গেল। রানার চোখে চোখ রাখলো, ‘এ কি?’

‘কুকুরে কামড়ে দিয়েছে।’

‘কুকুর!’—সোহানা চমকে উঠলো, ‘সকালে বেড়িয়েছিলাম ডক্টর অর্লিনের সঙ্গে। ডক্টরের একটা আদরের কুকুর আজ হারিয়ে গেছে।’
‘বেচারী—।’

‘হারান্ন নি।’—রানা মাথা নেড়ে বললো, ‘আমি হত্যা করেছি।’

‘তুমি?’

‘হ্যাঁ।’—রানা বালিশের তলা থেকে ছুরিটা বের করে বাথরুমের

দিকে যেতে যেতে বললো, ‘এই ছুরি দিয়ে কলেজে এফোঁড় ওকেঁড় করে দিয়েছি। আর একটা কথা, তোমার প্রিয় ভ্রমণ সঙ্গীকে আর যাই বল না কেন, বেচারী বলো না।’

সোহানা রানার পিছনে এসে দাঁড়ালো। রানা শাটটা খুলে ফেলেছে ততক্ষণে। সোহানা ব্যাণ্ডেজ চাপ চাপ রক্ত দেখে শিউরে উঠলো। এগিয়ে এসে ব্যাণ্ডেজ খুলতে রানাকে সাহায্য করলো। খোলা হলে যুগ্ম আর্থনাদ করে উঠলো। এবং দৌড়ে নতুন ব্যাণ্ডেজ এনে নতুন করে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে দিতে রানার কাছ থেকে শুনলো সব কথা মনোযোগ দিয়ে। তারপর জিজ্ঞেস করলে, ‘তার-কাঁটা বেড়ার ওপাশে কি হচ্ছে বলে তোমার মনে হয়?’

‘আমি ঠিক করে কিছু অনুমান করতে পারছি না।’—রানা বললো, ‘হাজার রকম সন্দেহ হচ্ছে, কোনটাই সুবিধার না। তবে পি. সি. আই-এর বুড়োকে খবর পাঠাতে পারো একটা প্রস্তর-ফলক তৈরী করার জন্তে। তাতে লেখা থাকবে, গ্রেট আইল্যান্ড, আমার কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের গৌরব মাসুদরানা এবং আমার আদরের বন্ধু কণা পরমা সুল্লরী সোহানা চৌধুরীর শেষ...।’

‘রানা!’—ধাক দিয়ে উঠলে সোহানা। ভয় পেয়ে গেছে ওর বাঁ হাতের আঙুলগুলো রানার ডান হাতের কনুইয়ের উপরের অংশ খামছে ধরেছে। চোখে বিভ্রান্ত চাউনি। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললো, ‘তুমি এক মুহূর্তের জন্তেও কি অল্প কথা ভাবতে পার না? অল্প কিছু...?’ শার্টের বোতাম লাগিয়ে দিল।

বিছানার শুরে পড়লো রানা, কাত হয়ে। সোহানা কাছে এসে বসলো। রানা ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে অল্প কথা ভাবতে চাইলো। একে নিয়ে অনেক কথা ভাবা যায়। যত্নের কথা ধুলে থাকা যায়। বেঁচে থাকা যায়। রানা বেঁচে থাকার চিন্তা ছাড়া

অন্ত কিছু ভাবতে পারছে না।

দরজায় নক হল। সোহানা দরজা খুলে দিতেই রানা ডক্টরের গলা শুনতে পেল। রানা ক্রাচে ভয় দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ডক্টর জিজ্ঞেস করলো, 'পায়ের অবস্থা কেমন?'

'ভাল।'—রানা বললো, 'আমার স্ত্রী ফাট'-এইড ট্রেনিং নিয়েছিল। একথাটা আজকেই জানলাম।'—রানা হঠাৎ কৌতুহলী হয়ে উঠলো, 'আপনার কুকুরটা পেলেন?'

'মিসেস্ মাসুদের কাছে শুনেছেন বুঝি? না, পাই নি।'—ডক্টর অলিনের কঠে বিষয় ভাব ফুটে উঠলো, 'আমার অনেক দিনের সঙ্গী। ডোবারম্যান পিনশার। অনেক দিন কাটয়েছি গুস্তফের সঙ্গে।'

'কোথায় যেতে পারে গুস্তফ?'

'হয়তো কোথাও সাপে কেটেছে।'—ডক্টর বললে, 'পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে একরকম বিষাক্ত ভাইপার আছে। হয়তো ওদিকে গিয়েছিল।'

'সাপ! ভাইপার!—সোহানা আতঁনাদ করে উঠলো, 'এদিকে নেই?'

'এদিকে নেই মিসেস্ মাসুদ, আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।'—ডক্টর অলিন বললে, 'সাপেরা ফসফেটের খুলোকে যমের মত ভয় পায়।'

সোহানা নিশ্চিন্ত হয়ে বললো, 'যদি কুকুরটাকে সাপে কামড়িয়ে থাকে তবে নিশ্চয় ওদিকে খুঁজলে লাশটা পাওয়া যাবে।'

'কে যাবে ওদিকে?—ডক্টর যেন শিউরে উঠলো, 'ওদিকে কেউ যায় না এ দীপের। যে গিয়েছিল সে আর ফেরে নি।'

সোহানা রানার দিকে তাকালো দুহুর্তের সঙ্গে। ডক্টর জিজ্ঞেস করলো, 'চলুন, সমুদ্রের দিকে ঘুরে আসা যাক। মিসেস্ মাসুদ তো সান্তার কাটবেন বলছিলেন।'

রানা বিছানায় বসে বললো, ‘ও যাক, আমি বরং একটা ঘুম দেই লাগু সেরে।’

বিকেলের দিকে রানার ঘুম ভাঙলো। দেখলো, কোচিমা, ডাকছে। হলুদ রঙের সোরাং-কাঁচুলি। খালি পা, চুলে ঝঁজে দিয়েছে লাল রঙের একটা বস্তা ফুল। রানার কাছে এর কিছুই আর আদিম মনে হচ্ছে না। ওর গোলাপী-পেটি নাইট আর হাই-হিলের কথা মনে পড়লো। সোরাং, কাঁচুলি, মাথার ফুল সবই ভেজাল। চাউনিটাও ভেজাল। ওর বাঁ গালের কালশিরেটাই একমাত্র আদিমতার চিহ্ন। ডক্টর গতরাতে চিহ্নটা একে দিয়েছে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে রোদ এসে ঘরে অল্প এক পরিবেশ রচনা করেছে। রানা উঠে বসে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলে, ‘মিসেস্ মাসুদ কোথায়?’

কোন উত্তর দিল না মেয়েটি, শুধু হাসলো। রানাও হেসে ওর হাতের ট্রে টি-পয়ে রাখতে ইঙ্গিত করলো। কোচিমা ট্রে নামিয়ে রেখে চলে গেল দ্রুত। রানা কফি ঢেলে নিলো। দেখলো, বিস্কুট দেওয়া হয়েছে। একটা বিস্কুট তুলে নিল। এ ধরনের বিস্কুটই দেখেছিল ক্যাপ্টেন মন দিউ-এর সুনারে। এ অঞ্চলে বোধহয় এ ধরনের বিস্কুটটা চলে বেশি। কিন্তু ডক্টর অলিনের চালান কতদিন অন্তর আসে?

বারান্দায় মোহানার সাড়া পাওয়া গেল আরো কিছুক্ষণ পর। ঘরে এল মোহানা। ভিজ়ে চুল। ভেজ়া জেরা-স্ট্রাইপ বিকিনির উপর একটা সাদা শার্ট চাপিয়েছে, কিন্তু বোতাম লাগায় নি। রানাকে বসে থাকতে দেখে অবাক হল মোহানা। বললো, ‘কখন উঠলে?’

‘এই তো, এখনই।’—গভীর কণ্ঠে বললো। ভাল করে দেখলো, মোহানাকে। বললো, ‘খুব সাঁতার কাটলে?’

সোহানা বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে রানার কণ্ঠস্বরে থমকে গেল। ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, ‘কাটতে হল ডক্টরের পাল্লায় পড়ে।’

‘কিছু বের করতে পারলে?’—রানা জিজ্ঞেস করলো, ‘কোনো তথ্য?’

‘না!’—বললো সোহানা, ‘একটা কাজের কথাও বলে নি ডক্টর, শুধু বকবক করছে।’

‘ওভার-ডোজ হয়ে গেছে।’—রানা হাসলো, ‘তোমার ও পোষাক বুড়োর হার্ট-বিট বাড়িয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই।’

সোহানা শার্টটা সামনের দিকে টেনে দিল। ওর স্নায়ু অগতিত উরু, মেদহীন শরীর, সংক্ষিপ্ত পোষাক পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার জ্ঞে যথেষ্ট। রানার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্তে তাকিয়ে থেকে বাথরুমের দিকে আবার এগিয়ে গেল সোহানা। ঘুরে দাঁড়ালো বাথরুমের দরজায়। বললো, ‘বুড়োর হার্ট-বিট বেড়ে গিয়েছিল হয়তো, তোমার তো আর বাড়ে নি!’

‘আমার?’—রানা গভীরভাবে দেখলো সোহানাকে। বললো, ‘আমার হার্ট-বিট বাড়তে পারে না, কারণ হার্ট বলে কোনো জিনিস বোধ হয় আমার নেই। তা চারটি রাত এক সঙ্গে কাটিয়েও কি বুঝতে পারো নি? দেখলে না, বুড়োর আদরের গুস্তফের বৃকের ভেতর কিভাবে ছুরি বসিয়ে দিলাম? শোন নি আমার কথা পি. সি. আই অফিসে বসে? কিভাবে জন্মহীন রানা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারে মানুষের বুকে?’

‘শত্রু বুকে।’—শুদ্ধ করে দিল সোহানা। এবং বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভাবলো: শত্রু কে? রানা কাকে বেছে নেবে শত্রু হিসেবে। শার্টটা খুলে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালো। জেব্রা-স্ট্রাইপ রেসিয়ার খুলে ফেলে দিল। শেটির দু’দিকে বুড়ো আঙ্গুল ঢুকিয়ে নিচে নামিয়ে দিয়ে বের করে আনলো দু’পা। নয় দেহে শাওয়ারের

কিরকিরে স্পর্শে বিচিত্র এক অনুভূতি হড়িয়ে দিল সারা শরীরে ।

ক্রাচ দু'টো পাশে রেখে সমুদ্র-বেলাতে বসে আছে রানা ।

লাল পেড়ে সাদা শাড়ীটা পরে সত্ত ফোটা ফুলের মত এসে
জ্ঞানার সামনে বসলো মোহানা । রানা কি যেন ভাবছে । জিজ্ঞেস
করলো, 'কি ভাবছো ?'

'ভাবছি তোমার কথা ।'—রানা বললো, 'তোমাকে দেখে ক্যাপ্টেন
দিউ তার মেয়ের কথা ভাবছিল । কিন্তু ডক্টর অলিন কার কথা ভাবে ?'

আবার রানা কথা কাটাকাটি করতে চায় । মোহানা কোনো
উত্তর দেবে না ভাবলো । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সহজ ভাবে হাসলো,
'তুমি কিন্তু ক্যাপ্টেন দিউর ভক্ত হয়ে পড়েছো ।'

'না, আমি শত্রু খুঁজছি ।'—রানা বললো, 'আচ্ছা, তুমিই একটা
হিসেব কর, আমি এক এক করে বলছি : আমাদের প্রথম শত্রু ধরলাম
দিউ । দিউ আমাদের বিভ্রাট করেছে । দিউ আমাদের হত্যা
করতে চেয়েছিল । কিন্তু আমরা পালিয়ে অলিনের নিরাপদ আশ্রয়
পেয়েছি ধরে নিতে পারি । কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দিউ আমাদের পালাতে
দিল কেন ?'

'জ্ঞানলে নিশ্চয়ই দিত না ।'

'দিউ জানতো ।'—রানা বললো, 'ভেটিলেটরের মুখেই রেডিও-রুম ।
তুমি একটা জিনিস খেয়াল কর নি যে, ভেটিলেটরের মুখ বাতাসের
দিকে ঘোরানো ছিল না, ছিল পেছনের দিকে ঘোরানো । এবং
ক্যাপ্টেন ভেটিলেটরের সামনে বসে আমাদের হত্যার পরিকল্পনা করেও
দু'ঘণ্টা সময় দেয় । ক্যাপ্টেন দিউ বন্দীকে লাইফ-বোর্ড এবং প্রয়োজনীয়
সব জিনিস-পত্রের সঙ্গে কেন রেখেছিল ? তুমি জানো লাইফ-

বেশ্টওলো বাভিল জিনিসের ভেতরে রাখা হলেও প্রত্যেকটাতে CO₂ চার্জ করা ছিল। শুধু তাই না, ডেকের ঢাকনার বর্টুও ক্যাপ্টেন আলগা করে রেখেছিল, নইলে জ্যাকের সামান্য চাপেই ওভাকে খুলে যেত না ওটা। তারপর আমরা যখন বেরুলাম, কোনো গার্ড ছিল না তখন। জাহাজে ও প্যাসেজটার কোনো আলোও রাখা হয় নি। এর মানে, জ্বনার থেকে পালানোর পরিকল্পনা আমাদের নয়, ক্যাপ্টেনেরই। ক্যাপ্টেন জ্বনারটাকে এমন একটা ঘোড়ের মুখে এনে ফেলেছিল যেখান থেকে আমরা সহজেই কোরাল-রীফে পৌঁছে যাই। তা ছাড়া রাতে ঘুমের ঘোরে আমি মানুষের কণ্ঠস্বর শুনেছি। অত সকালে ডক্টরের লোকেরা আমাদের পেয়ে যাওয়াটাকে কো-ইলিডেল বলা ঠিক হবে কি?’

‘মানে তুমি বলতে চাও, ক্যাপ্টেন এবং ডক্টর এক সঙ্গে কাজ করছে?’

‘আমি সম্ভাবনার কথা বলছি।’—রানা একটা সিগারেট ধরালো ও সোহানা পানির ড্রামে তার পোষাক একটু বেশি আনলেও রানার সিগারেট কটাঁনের কথা ভোলেনি।

সোহানা কয়েক মুহূর্তের জন্তে স্তব্ধ হয়ে থেকে বললো, ‘ডক্টর আমাদের দিয়ে কি করবে?’

রানা উত্তর দিল না। এ প্রশ্ন রানাও ভাবছে।

‘ক্যাপ্টেন দিউ এভাবে কায়দা করে আমাদের এখানে না ফেলে একেবারে হাতে হাতেও পৌঁছে দিতে পারতো।’—সোহানা বললো।

‘এর পেছনে অনেক পরিকল্পনা কাজ করছে। এবং সে সব পরিকল্পনা অতি বুদ্ধিমান কারো মাথা থেকে বের হয়েছে। প্রতিটা ঘটনার পেছনেই কেউ একজন আছে এবং তার বিরাট কোনো পরিকল্পনা রয়েছে।’

‘কে সে?’—সোহানা জিজ্ঞেস করলো। একটু থমকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলো, ‘ডক্টর অলিন?’

‘ডক্টর কি না জানিনা।’—রানা বললো, ‘পরিকল্পনাটা কি, তাও জানিনা। তবে আমি রাতে দেখা তার কাঁটার বেড়াটাকে ভুলতে পারছি না। ওখানে চাইনিজ নেভীর লোক রয়েছে। ওখানে বিরান্ট কিছু ঘটছে, গোপনে। হতে পারে, পিকিং সরকারই কিছু করছে, কিন্তু খুবই সতর্কতার সঙ্গে। তারা জানে, একজন খাম খেলালী বিদেশী আর্কিওলজিস্ট এখানে কাজ করছে অনেক দিন থেকে।’

‘চাইনিজ যদি গোপনেই কিছু করবে তবে ওকে এখানে থাকতে দেবে কেন?’

‘দিয়েছে ভালমত তদন্ত করেই। ক্ষতিকর না কেনেই। বহু মনে করে।’—রানা বললো, ‘থাকতে দিয়েছে শুধু নয়, রেখেছে বাইরের পৃথিবীর কাছে এ দীপের একটা অন্তরূপ দিতে, আসল জিনিস গোপন করতে।’

‘তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ডক্টরের সঙ্গে চাইনিজদের গোপন যোগাযোগ আছে, দিউ এর সঙ্গেও ডক্টরের যোগ আছে এবং ...’

‘এবং, আমাদের সরকার চাইনিজদের এই ব্যাপারটা জানে, এখানে যা হচ্ছে আমরা তার কিছুটা অংশীদারও বটে। মেজর জেনারেলও ব্যাপারটা জানেন।’

রানা উঠে দাঁড়ালো, ‘মেজর জেনারেলের পরিকল্পনা মত আমরা ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছি। এটাই আমাদের নিয়তি।’

‘তবে আমরা ডক্টর অলিনকে বিশ্বাস করতে পারি।’—সোহানা বিধাগন্ত কণ্ঠে বললো, ‘কারণ আমরা...’

‘মেজর জেনারেল কাউকে বিশ্বাস করতে এখানে আমাদেরকে পাঠায় নি।’—রানা বললো, ‘আমি শুধু ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিকতাকে অনুমান করলাম। কারণ, দলের লোক হয়েছে ডক্টর কেন কুকুর ছেড়ে দেয়, খোপের মধ্যে লোকেরা কি দেখে?’

‘হতে পারে ডক্টর অলিন এদিকে ওদের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্তে গাভের ব্যবস্থা করেছে।’—সোহানা বললো।

‘হতে পারে।’—রানা বললো, ‘তা হলে আমরা এখানে এলাম কেন?’

‘আমরা দাবার বোজে, দাবাড়ুদের বেসামাল চাল।’—সোহানা বললো, ‘মেজর জেনারেলের ভুল।’

‘মেজর জেনারেলের ভুল।’—রানা মাথা নাড়লো, ‘এত বড় ভুল মেজর জেনারেল করেন না, সোহানা। আমাদের আরো কিছু জানতে হবে। জানতে হবে এই বুড়ো আদৌ ডক্টর অলিন কিনা।’

‘রানা!’—সোহানা কিছু একটা আবিষ্কার করেছে যেন, বললো, ‘হ্যাঁ, আমাদের জানতে হবে, ও ডক্টর অলিন কিনা। জানো, ও আমাকে এমন সব কথা বলেছে যা ডক্টর অলিনের মত জ্ঞানী লোকের কাছ থেকে আশা করা যায় না। আমি একে যতবার ইজিপ্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি ও শুধু পলিনেশীয়ানদের সম্পর্কে বলেছে। আমি যতবার গ্রেটা আইল্যান্ড সম্পর্কে তার লেখাগুলো পড়তে চেয়েছি ও অমনি অন্য কথায় চলে গেছে।’

‘আমি আকিওলজি সম্পর্কে কিছু না জানলেও এটুকু জানা আছে, তুসকানি-হিলে একটা কয়লার খনিতে ৬০০ ফিট গভীরে একটা কক্ষাকৃ পাওয়া গেছে। অথচ ডক্টর বললেন, ১২০ ফিট গভীরে পাওয়া কাঠের ঘরের নমুনা হচ্ছে একটা রেকড’।’—রানা বললো।

‘কিন্তু ওয় পাওয়া জিনিসগুলো তো মিথ্যে নয়?’

‘নাও হতে পারে। কোন্টা মিথ্যে কোন্টা সত্য কিছুই আমরা জানি না। আজ রাতে আমি ঘের করবো, সত্যি ঘটনা কি।’

‘আজ রাতে?’

‘হ্যাঁ।’

‘এই হাতের অবস্থা নিয়ে?’

‘হ্যাঁ।’—রানা বললো, ‘হাতটা কোনো প্রয়োজনেই আসবে না যদি এখান থেকে বেঁচে বেরুতে না পারি।’

সোহানা রানার কাছে এগিয়ে এল। সামনে দাঁড়ালো। রানা আর একটা সিগারেট বের করে মুখে লাগালো। সোহানা রানার হাত থেকে লাইটারটা নিয়ে সেটা ধরিয়ে দিয়ে বললো, ‘রানা, একটা কথা রাখবে?’

রানা অবাক হয়ে তাকালো সোহানার চোখে। বললো, ‘বলো।’

সোহানা আরো কাছে বেঁধে এল। ওর নরম বুকের স্পর্শ পেল রানা।

‘আমাকে আজ সঙ্গে নিয়ে চল।’

‘না!’—সরিয়ে দিল রানা সোহানাকে।

‘রীজ, রানা।’—সোহানার কণ্ঠে মিনতি। বললো, ‘তুমি এভাবে একা...’

‘তুমি গিয়ে কোনো লাভ হবে না। আমাকে একাই করতে হবে এই কাজটা।’

‘আমি এ মিশনে তোমাকে সাহায্য করতেই এসেছি।’

‘এই একটা ভুল করেছে মেজর জেনারেল।’—রানা বললো, ‘কারণ এ মিশনে পাঠানো উচিত ছিল একটা ট্রেইণ্ড মেনে। স্পাই হিসাবে মেয়েরা একটা কাজই করতে পারে এবং করতে দেওয়া হয়, তা হল মাদাহারির ভূমিকা। পুরুষের কানের কাছে মিষ্টি কথা বলে, মিষ্টি হেসে, ছলনা করে মনের কথা বের করে নেওয়া। এ কাজ তুমিও করতে পারো। গতরাতে আমি আর একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি: ডক্টর অলিনের চুল পেকে সাদা হয়ে গেলেও রসিক মানুষ! তোমার উপরেও তার চোখ আছে। বুড়োর চোখের

ভাষা পড়তে পারো নিশ্চয়ই।’

সোহানা কথা না বলে রানার কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করলো। বুঝতে চেষ্টা করলো, এটা কি ধরনের রসিকতা। তারপর বললো, ‘তোমার সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে আমি ঝেঁটে ক্লান্ত। আমার দ্বারা বোধহয় এ অভিনয় চলবে না, ধরা পড়ে যাবো।’—উঠে দাঁড়ালো সোহানা। বললো, ‘আমি চললাম।’

রানার জন্তে দাঁড়ালো না। রানা ক্রাচ ভর দিয়ে রওয়ানা হল। দেখলো, সোহানা প্রায় দৌড়ে চলে যাচ্ছে।

মেজর জেনারেল ভুলই করেছেন। এ ধরনের সেন্টিমেন্টাল মেয়েকে একাজে পাঠানোই উচিত হয় নি। সব কাজ সবার জন্তে নয়।

ওদের মধ্যে আর কথা হল না। কোচিমা রাতের খাবার দিয়ে গেল, কোন কথা বললো না। দু’জন চূপ চাপ খেলো। রানা মনে মনে অনেকবার চেষ্টা করলো এ নীরবতা ভাঙতে। কিন্তু কেন যেন পারছিল না। বিরক্তিতে ভরে যাচ্ছিল মন। খাওয়া হয়ে গেলে রানা শূন্যে পড়লো। সোহানা আলো নিভিয়ে দিয়ে শূন্যে পড়লো পাশেই। আধ ঘণ্টা পর উঠে জানালার দাঁড়িয়ে রানা বাইরেটা দেখে বিছানায় বসে পায়ের ব্যাণ্ডেজটা খুলে জুতো পাল্পে দিল। পেজিল টর্চটা পকেটে রাখলো, ছুরিটা নিল কোমরে। হাতের ব্যাণ্ডাটা অনুভব করলো এবং আরো কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে সোহানার দিকে তাকালো। একভাবে শূন্যে আছে। বোকা যাচ্ছে ঘুমোর নি। রানা ডাকলো, ‘সোহানা।’

‘জি।’—শূন্যে শূন্যেই উত্তর দিল।

‘যাচ্ছি। তোমার ঘরে থাকাই বেশি দরকার। ভট্টর রাতে খোঁজ নিতে আসতে পারে যে কোন মুহূর্তে।’

সোহানা কোন কথা বললো না। রানা জানালা দিয়ে বাইরে

নেমে গেলে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু রানাকে দেখতে পেল না। চম্পালোকিত রীপটা দেখতে লাগলো সোহানা। গাছ, ছায়া...সব তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হল। দুর্বোধ্য মানুষটা কি শাতুতে গড়া! রানার চেহারাটা ভাবলো। অথচ কি আশ্চর্য, এই একটু আগের যেখা চেহারাটা সে মনে করতে পারছে না। সোহানার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।...দেখলে, দূরে কালো পাহাড়ের ভৌতিক ছায়া।

আধ ঘণ্টা পর ওহায় পৌঁছল রানা। বাঁ হাতে ছুরিট ধরলো, টানেলের দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেল। প্রথম ওহায় পৌঁছে দাঁড়ালো না, এই টানেলের মুখোমুখি টানেলে গিয়ে প্রবেশ করলো রেল-লাইন পারে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। দ্বিতীয় টানেলে প্রবেশ করতে পাঁচ মিনিট লেগে গেল। আরো ত্রিশ মসেকাও, রানা পৌঁছলো দ্বিতীয় ওহায়, যেখানে ডঃ অলিন তার প্রথম আবিষ্কার দেখিয়েছিল। রানা দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। না, কেউ আলো জ্বাললো না, কেউ কাঁপিয়েও পড়লো না। রানা এক, দ্বিতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। অথবা তারা অপেক্ষা করছে। এই ওহায় এক প্রান্তের দু'টো স্তূপে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেদিকে না গিয়ে তার পরের স্তূপে প্রবেশ করলো রানা। এখানেই ওয়াং কাজ করছিল তার লোকজন নিয়ে। এখন রানা আর্কিওলজিতে হতমন উৎসাহী নয়। রেল-লাইন ধরে তৃতীয় ওহায় প্রবেশ করলো। সেটাকে ছাড়িয়ে চতুর্থ ওহায় পড়লো। চতুর্থ ওহায় একটি ওহা-মুখ পাওয়া গেল পশ্চিম দিকে। রানা স্তূপে প্রবেশ করলো। এখানে এই একটু-ই স্তূপ।

রানা স্তূপের দেয়ালে হাত রেখে অন্ধকারে এগিয়ে চললো।

এখানে কোন ভূতাত্ত্বিক খনন হয়নি। ওহাটা সোজা এগিয়ে গেছে। চলতে চলতে রানার মনে হলো এ ওহার শেষ নেই। একরোখা বোড়-সওয়ারের মত এগিয়ে গেছে, শুধু এগিয়েই গেছে যেন কোনো অজানা দেশের উদ্দেশ্যে। এবার চোখ-কান সচেতন রেখে এগুচ্ছে রানা, প্রতি পদক্ষেপে হিসাব করে। স্নুডজটা সংকীর্ণ হয়ে আসছে ক্রমে। এবং উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, স্নুডজে বাতাসের অভাব নেই। প্রথম স্নুডজের মুখ থেকে দেড় মাইল ভেতরে এসেও এই বাতাস। রানা অনুমান করলো, স্নুডজটা ক্রমে উপরের দিকে উঠে পাহাড়ের উঁচু ঢালে গিয়ে মেশার ফলে বাতাস ঝাড়াভাবে চাপ সৃষ্টি করছে। রানা অনুমান করলো, এখন সে সমতল পথে চলছে। তারপরেই নিচের দিকে ঢালু হয়ে গেছে স্নুডজটা। এগিয়ে চললো ও অন্ধকার ভেদ করে, দেয়াল ধরে। দেয়ালটা হঠাৎ হাত ছাড়া হয়ে গেলো।

দাঁড়িয়ে পড়লো রানা। ছুরিটা ডান হাতে ধরে বাঁ হাতে পেল্লি টর্চটা বের করলো। এখানে একটা ওহা। আনুমানিক ত্রিশ ফুট গভীর। ভাঙা পাথরে অধেকটা ওহা বোঝাই। এটা স্নুডজ তৈরী করার সময় পাথর স্টোর করার জায়গা। আরো তিন শো ফিটের মত সামনে এগিয়ে গেল রানা। মাথাটা হঠাৎ ঠুকে গেল পাথরে। হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরলো। অনুমান করলো, স্নুডজ শেষ হয়েছে। অন্ধকারে পেল্লি-টর্চের আলো জ্বাললো। দেখলো, এখানে ভাঙা পাথরের টুকরোর মধ্যে পড়ে আছে দু'টো খালি বাস। টর্চের আলোতে এখনো দেখা যাচ্ছে ব্রাট্টিক পাউডারের চিহ্ন। রানা স্নুডজের শেষ প্রান্তের দেয়ালের পাথরে টর্চের আলো ফেললো। একটা সলিড পাথর—সাত ফিট উঁচু চার ফিট চওড়া। আরো সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করলো রানা এবং বের করলো, আই লেভেল

একটা গোলাকার পাথর। পাথরটা টেনে খসিয়ে আনলো। বেরিয়ে পড়লো একটা ছিদ্র। ছিদ্রপথে চোখ রাখলো। চোখে পড়লো অনেকগুলো মিটমিটে আলো। আকাশের তাঁরা। এখান থেকে আকাশ দেখা যাচ্ছে। রানা আবার বসিয়ে দিল পাথরটা যথাস্থানে।

অনুমান করলো ওটা পশ্চিম আকাশ। এটা পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্ত।

আবার ফিরে এল রানা। প্রথম ওহা চারটার চতুর্থ ওহায় এল। অস্ত্র স্ফুটলো পরীক্ষা করলো। স্ফুটলোর মুখে একটা করে ওহা আছে, কিন্তু তারপর আর কোন স্ফুটন নেই। তৃতীয় ওহার অস্ত্র স্ফুটলো খুঁজতে গিয়ে কিছু পেল না, কিন্তু পথ হারালো। অন্ধকারে। আশঙ্ক্যটার মধ্যে বেরুবার কোন পথ পেল না। তারপর রেল-লাইন ধরে দ্বিতীয় ওহায় এল এবার দু'টি স্ফুটন উত্তর দিকে গেছে। একটাতে ওয়াং কাজ করছিল। সে স্ফুটন দিয়ে এগিয়ে গিয়েও নতুন কিছু পেল না। রানা অনুমান করে এসে দাঁড়ালো লসে-পড়া স্ফুটনের মুখে। ডক্টর অলিনকে এখন আর বিশ্বাস করার প্রায় ওঠে না। ঘন করে পিলার বসানো স্ফুটন মুখে। রানা হাতিয়ে আশা ইঞ্চি একটা ফাঁক বের করে টর্চ জ্বালিয়ে আলো ভেতরে ফেললো। দেখলো, ডক্টর অলিন অস্ত্রতঃ একটা বিষয়ে সত্যি কথা বলেছে, ভেতরে ভাঙা পাথরের চাঁই স্ফুটনটাকে ব্লক করে দিয়েছে।

রানা দ্বিতীয় বন্ধ স্ফুটন-মুখের কাঠের পিলারে ফাঁক খুঁজতে গিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করে বসলো। বহু ব্যবহারে দু'টো কাঠ আলগা হয়ে এসেছে।

ত্রিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করলো রানা। দম নিয়ে পকেটমারের চেয়েও সাবধানে কাঠটা সরিয়ে পাথরের কাঠে হেলান দিয়ে রাখলো। একটু শব্দও হল না। হয় ইঞ্চি ফাঁক হল। এবার টর্চ ফেলে

দেখলো, পরিষ্কার মেঝে, পরিষ্কার ছাদ। কোথাও ভাঙার চিহ্নও নেই। আলো নিভিয়ে দ্বিতীয় কাঠটাও খসিয়ে ফেললো রানা। এবং ভেতরে ঢুকে পড়লো। একটা কাঠ আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিল ভিতর থেকে। কিছু বাকি ছয় ইঞ্চি জায়গায় ছয় ইঞ্চি কাঠটা বসাতে পারলো না। আর কোন উপায় না দেখে ওভাবে রেখেই রানা ভেতরের দিকে এগিয়ে চললো। স্তূপের দেয়ালে হাত রেখে। কিছু দূরে যেতেই রানা একটা উত্তেজনা বোধ করলো, বাঁ দিকে ক্রমেই বাঁক নিচ্ছে স্তূপটা। হাতে কিসের যেন একটা শীতল স্পর্শ পেরে গমকে দাঁড়ালো। সরিয়ে নিল হাতটা। দম বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে আবার হাতটা বাড়িয়ে দিল।

একটা চাবি। দেয়ালের ছকের সঙ্গে খুলছে।

কাছে দরজা আছে।

চাবিটা ছেড়ে দিয়ে দেয়াল হাতিয়ে একটা কাঠের দরজার সন্ধান পেলে রানা। খাড়া কাঠ দিয়ে তৈরী দরজা। কি-হোল বের করলো অন্তরঙ্গ হাতিয়ে। তারপর চাবিটা নিল দেয়াল থেকে। তালা খুলে ফেললো। এবং খুব আন্তে আন্তে চাপ দিতে লাগলো। দুই-এক ইঞ্চি করে খুলতে লাগলো দরজাটা। খোলার সঙ্গে সঙ্গে রানা একটা গছ পেল, ডেল ও সালফিউরিক এসিডের মিলিত গছ। দরজার কজার শব্দ বেজে উঠল কীয়াচ করে। আরো সাবধানে একটা মানুষ বাবার মত ফাঁক করে ঢুকে পড়লো এবং ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে টচ'টা জ্বাললো রানা।

কেউ তার জন্তে অপেক্ষা করছে না। আলোটা চারদিক ঘুরিয়ে নিল। এবং বুঝতে অসুবিধা হল না, কিছুক্ষণ আগেও কেউ এখানে এসেছিল। কয়েক পা এগিয়ে গেল রানা। পায়ে বাধলো ভারি একটা বস্তু। দেখলো, এসিড একুমুলেটর। এর থেকে একটা তার দেয়ালের

দিকে চলে গেছে। রানা টচের আলোতে স্নাইচ খুঁজে বের করলো। টপে দিতেই উজ্জল আলোর ভরে গেল গুহাটা। উজ্জল মানে প্রয়োজনীয় আলো।

রানা ঘরের কোণে অনেকগুলো বাস দেখলো। চেনা চেহারা। বাসগুলো আগে কোথাও দেখেছে রানা। দেখলো। এ্যামোন্ডাল এক্সপ্লোসিভের বাস। দেখে বুঝলে, ক্যাপ্টেন দিউ-এর সুনামে এই বাসগুলি দেখেছিল সে। ওই দুর্ভাগের রাতেই ক্যাপ্টেন দিউ এই বাসগুলো নামিয়ে দিয়ে গেছে।

দেয়ালে দু'টি কাঠের তাকে সাজানো রয়েছে নতুন ধরনের মেশিন-পিস্তল এবং অটোমেটিক কারবাইন। প্রত্যেকটা অস্ত্র যন্ত্রের সঙ্গে শীজ লাগানো হয়েছে, গুহার ড্যাম্প থেকে রক্ষার জন্তে। পাশেই এ্যামুনিশনের বাস। রানা কোমরের ছুরিটার বাঁটে হাত রেখে হাসলো। এগিয়ে গেল এ্যামুনিশনের বাসের দিকে। ডালা খুলে অবাক হয়ে গেল। বাসটা ভর্তি কালো ব্রাউন পাউডারে। তারপরের বাসে এম্বাটল এক্সপ্লোসিভ, মৌচাকের মত। তারপরের একটা স্ক্রামে রয়েছে পয়েন্ট ফরটি-ফোর শটগানের গুলি। রানা চোখ বুলিয়ে গেল মার্কারী ডিটোনেটর, R. D. X. ফিউজ, কেমিক্যাল ইগনিটার, ইত্যাদির উপর দিয়ে। রানা চকচকে কারবাইনগুলো আর একবার দেখে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। গুলি ছাড়! কারবাইন, অসহীন ঘোড়-সওয়ার। দীপটা দখল করা আর হলো না।

সুড়ঙ্গ ধরে আরো বিশ গজ এগিয়ে গিয়ে রানা আরো একটা দরজা পেল। একই ধরনের দরজা। কিন্তু এর কোন তালা-চাবি নেই। নব ধরে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। শীতল বাতাসের স্পর্শ রানাকে কাঁপিয়ে দিল।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করলো এবং অস্ত্র

‘ধরটার হিসেব মত হাত বাড়িয়ে জুইচ খুঁজে বের করলো। জুইচে
স্ট্রিপ দিয়েই ওহার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল।

কিন্তু এটা কোনো ওহা নয়, এটা মন্দির।

৭

ওহার ভেতরের আদ্রতা এবং লাইম-স্টোনের ফসফেটের সংমিশ্রণই
হয়তো লাশগুলোকে অবিকৃত রেখেছে।

রানা মেঝেতে পড়ে থাকা যতদেহগুলো দেখে এ-কথাটাই ভাবলো।

পচন ধরছে, কিন্তু সামান্য। চেহারাগুলো চেনা যায়!

সবার গরনের শাটের সামনের দিকের কালচে দাগ সবার পোস্ট-
মর্টেম রিপোর্টের কাজ করছে। একটি মহিলার নগ্ন যতদেহ। পুরো
নগ্ন নয়। কাঁচুলি আছে। নিম্নাংশ অনাবৃত।

রানা শ্বাস নিচ্ছিল মুখ দিয়ে এবার। দু’আঙুলে নাকটা ধরলো,
স্বঁকে পড়ে প্রত্যেকের মুখে টর্চের আলো ফেললো। প্রায় সবগুলো
অচেনা মুখ। একজনকে চিনলো: ডক্টর পীয়ের অলিন! সাদা
দাড়ি সাদা চুল, সাদা ক্র সাদা গাঁফ, আসল ডক্টর অলিন। তার
পাশের লাশটা ডক্টর হুয়াং-এর যার কথা নকল ‘অলিন’ বলেছিল,
‘ম্যাগ্নেটিকা হওয়ার্তে পিকিং গেছে, যার ছবি দেখেছিল ‘স্টার
ডে রিভিউ’ পত্রিকায়। সেই সাড়ে ছয় ফিট লম্বা লোকটার লাশ।

কপালের ঘাম চোখের ধার ঘেঁষে নামতে চোখ জালা করে উঠলো রানার। ঘাম বসে যাচ্ছে, অথচ শরীর কাঁপছে যেন শীতে। কি যেন ঝিক্ করে উঠলো। ছুরিটা ডান হাতে অকারণেই শক্ত করে ধরলো রানা। নিভিয়ে দিল পেন্সিল-টচ'। গদ্য! নয়টি লাশ ছাড়াও অস্ত্র কিছুর উপস্থিতি অনুভব করলো ও। প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো। নিজের নিঃশ্বাসই রানাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইলো। ঘরের অস্ত্র পাশে অন্ধকারে একটা কালো মত কিছু নড়ে উঠলো।

থেকে গেল হাট' বিট। দু'টো মানুষ-মূর্তি এগিয়ে আসছে। এবং পনেরো ফিটের মধ্যে এসে পড়েছে। দু'দিক থেকে দু'জন বিষে ফেলতে চাইছে রানাকে। চাইনিজ। পরনে পাজামা, খালি পা। দু'জনের হাতে দু'টি ছুরি। চকচক করে উঠেছিল এই ছুরিই। পদক্ষেপে বোকা যন্ত্র, দু'জনই পাকা খেলওয়াড়। দু'জনেরই চোখ রানার উপরে স্থির। ছুরি উঁচু করলো রানা। ছুটে গেল ওদের দিকে।...ওরা কাত হয়ে গেল। ছুরি বাগিয়ে ধরলো। কিন্তু রানার লক্ষ্য ওরা নয়—ছুরির বাঁট গিয়ে লাগলো অলস্ত বাল্বে। এবং কাত হয়ে মেঝের উপর অন্ধকারে গড়িয়ে পড়লো। কাঁচ ভাঙার শব্দ, আর অন্ধকারে ভরে গেল গুহা। অন্ধকার, অন্ধকার! এবার রানা ভাবলো : আমি শত্রুর বুকেই ছুরি বসাবো, একশো ভাগ নিশ্চয় হয়ে। কিন্তু ওদের ছুরি চালাবার সময় বস্তুর কথা ভাবতে হবে, হাত কেঁপে যাবে। রবারের সোলের উপর ভর করে নিঃশব্দে কয়েক পা সরে গেল। পায়ের এক পাটি জুতো খুলে ছুঁড়ে দিল দরজার মুখে। ওরা দু'জনই ছুটে গিয়ে কাঁপিয়ে পড়লো দরজার কাছে শব্দ লক্ষ্য করে। হটোপুটি খাবার শব্দ, তারপরেই অকস্মাৎ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো একটা আর্দনাদ।

পতনের শব্দ।

অলে উঠলো রানার হাতের টর্চ। দু'জনের উপর গিয়ে পড়লো আলো। একটা হত্যাকাণ্ডের মুখ, অন্ধ মুখে বিস্ময়। একজনের দেহ মাটিতে পড়ে আছে উপুড় হয়ে। বিশাল ছুরি বুকের ভেতর গিয়ে ঢুকেছে। পিঠের মাঝখান দিয়ে রক্তাক্ত চকচকে মাথা বেড়িয়ে গেছে। বিন্মিত মুখটা এবার চমকে উঠলো ভয়ে। কাঁপিয়ে পড়লো বন্ধুর হাত থেকে খসে পড়া ছুরির উপর। কিন্তু তার আগেই কাঁপিয়ে পড়েছে রানা। একই গতিতে লোকটার পাঁজরের পাশ দিয়ে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিল সমস্ত শক্তিতে। আরেকটা আর্তনাদ শুধা-দেয়ালে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর সব স্থির, সব নীরব।

আবার আলো ফেলে দু'টো রক্তাক্ত দেহ দেখলো রানা। এগারোটট হতদেহ। একজন জীবন্ত মানুষ—রানা।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো রানা পাঁচ মিনিট। নতুন শত্রুর প্রতীক্ষায়। এখন রানা নাকে মুখে খাস নিচ্ছে। না, কেউ এল না। হাতের গন্ধ আর নাকে লাগছে না। টর্চ অলে জুতোটা বের করলো খুঁজে, পায়ে দিল। ছুরিটা বের করলো ওদের একজনের পাঁজর থেকে টেনে। মুছলো ওপরের লাশটার পিঠে। কোমরের বেগ্টে রাখলো না, হাতে ধরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনাটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করলো। ক্রান্তিতে চোখ বঁজলো। বাঁ হাতের কতে প্রচণ্ড ব্যথা। সমস্ত শক্তি দিয়ে সামনে এগিয়ে চললো...কে গান গায়। চমকে রানা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। একটা সুর কানে ভেসে আসছে দূর থেকে।

রানার মাথার মধ্যেই যেন বাজছে সুরটা। এতক্ষণ যা ঘটলো, রানা যা করলো তাতে এমন বিকার হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আরো কয়েক সেকেন্ড কাটার পর বুঝলো, এটা বিকার নয়,

পরিকারভাবে শোনা যাচ্ছে—কেউ যেন গুন গুন করে গাইছে, ‘থ্রু কয়েল ইন দা ফাউনটেইন...থ্রু ওপেন হাটস...’—প্রথমে একটা কণ্ঠ গাইছিলো, আরো একটা কণ্ঠ তাতে যোগ হল। এবং দু’টো কণ্ঠই নারীকণ্ঠ।

রানা মাথা ঝাঁকালো। না, গান থেমে গেল না। নারী কণ্ঠের গান এখানে কোথেকে আসতে? রেকর্ড?

টানেল ধরে এগিয়ে গেল রানা শব্দটা লক্ষ্য করে বাঁ দিকে নকশি ডিগ্রী বাঁক নিয়ে। বিশ পঁচিশ গজ হাঁটার পর আলোর আভাস দেখতে পেল। আরো দু’বার মোড় নিয়ে এগিয়ে চললো। আলোও বাড়তে লাগলো। আলোকিত হয়ে উঠছে গুহা।

এবং আরেক মোড় নিতে গিয়ে শেষে পেল। আড়ালে দাঁড়ালো। দেখলো, সুড়ঙ্গের প্রান্তে একটা লোহার গেট। গেটের মাঝখানে। কিছুটা জায়গা, তারপর দ্বিতীয় গেট। মাঝে একটা বাল্ব জলছে। বাল্বের নিচে দু’জন কারবাইনধারী দাঁড়িয়ে।

গান এখন পরিকার শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে নারীকণ্ঠের কথা। কারবাইনধারী উঠে গালি দিল ওদের উদ্দেশ্যে। কয়েক সেকেন্ডের জন্তে গান থামলো। কিছু কথা শোনা গেল। আবার শুরু হল গান।

এরা কি নিখোজ বিজ্ঞানীদের নিখোজ জী?

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে রানা। হাতের ছুরি আরো শক্ত করে ধরলো। এগিয়ে যেতে গিয়েও নিজেকে সংযত করলো। ওদের হাতে দু’টো কারবাইন—এ ছুরিটা ওদের বিরুদ্ধে এক মিনিটও লড়তে পারবে না।

আর কিছু ভাবলো না রানা। ভাবার শক্তি তার নেই। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবারও কিছু নেই। সব ঘটনা পরিকার দেখতে পাচ্ছে ও।

ফেরার পথ ধরলো রানা। ফেরার পথে শুধু একটা কথাই ভাবতে পারলো, পালাতে হবে।

ওহা থেকে বেরুতেই দেখলো, প্রবল ধারার ঝুটি হচ্ছে।

ডক্টর অলিনের কুঠিতে আলো জ্বলছে।

রানা ধাঁড়ালো গেট-কোয়ার্টারের পেছনের জানালার নিচে। আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সোহানা।

না ঘুমায় নি সোহানা।

জানালার বেয়ে উঠতেই দেখলো, সোহানা দাঁড়িয়ে। রানাকে ধরলো। ভিতরে আসতে সাহায্য করলো। পদা টেনে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে যদু কঠে বললো, 'এত দেরী করলে তুমি! আমি ভেবে-ছিলাম... ভেবেছিলাম...'

'বিধবা হয়ে গেছো?'—সোহানার কাঁধে হাত রেখে ওর মুখটা দেখলো। বললো, 'একশো ভাগ শিওরিটি দিতে পারি, আমি বেঁচে আছি, দেখ!'

'সোহানা।'—সোহানা কিছু বলার আগেই রানা বললো, 'আমাদের খবর পৌঁছাতে হবে চাইনিজ নেভীর কাছে। পালাতে হবে এখনই।'

'পালাতে হবে।'—সোহানা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে আলোটা উস্কে দিল। আলোর রানাকে দেখে অঁতকে উঠলো ও। বললো, 'তোমার গায়ে রক্ত কেন? আজ...!'

'আজ কুকুর নয়, মানুষ।'—রানা বললো, 'ডঃ অলিনের লোক। ওরা এখনই খোঁজ পেয়ে যাবে। আমাদের আবার সাঁতার কাটতে হবে। তৈরী হও জলদি।'

'কিন্তু...।'

‘আসল ডঃ অলিন এবং তার সহকারীদের হত্যা করেছে এরা।
ব্রিগেট যড়যন্ত্র চলছে। তুমি তৈরী হতে থাক, আমি বলছি সব।’—
রানা বললো, ‘সঁাতারে সুবিধা যাতে হয় সেভাবে পোষাক পরবে।
তবে বিকিনি টিকিনি নয়। স্নান পর। শার্কের উৎপাত হতে পারে,
শরীর আলগা না রাখাই ভালো। আমার হাতের রক্তক্ষরণ ওদেরকে
এমনিভেই ক্ষেপিয়ে তুলবে।’

রানা পোষাক পরতে পরতে বললো টানেলের কথা। আসল
ডক্টরের কথা। মহিলার কথা। এবং বৈজ্ঞানিকদের স্ত্রীদের কথা।

সোহানা জিজ্ঞেস করলো, ‘বৈজ্ঞানিকরা কোথায় আছে?’

‘কাঁটা-তারের ঘের দেওয়া অংশে নিশ্চয়ই কিছু হচ্ছে। হয়তো ওরা
ওখানেই আছে। ওদের স্ত্রীদের বন্দী করে রাখা হয়েছে, যাতে
করে বৈজ্ঞানিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।’—রানা বলতে
লাগলো, ‘এই শন্নতান বুড়োটা পাহাড় খুঁড়ে শেষ সীমায় পৌঁছেছে।
অপেক্ষা করছে শুধু একটা বিশেষ মুহূর্তের। সে মুহূর্ত এলেই স্ফুটনের
শেষ-প্রান্ত খুলে যাবে। আক্রমণ করবে চাইনিজ নেভীকে।’

‘আমরা কি করে এটা বন্ধ করতে পারি?’

‘চেষ্টা করতে হবে।’—রানা লাইফ-বেন্ট হাতে তুলে নিল।
বললো, ‘কিছু একটা করার জন্তেই ঢাকার ওই বুড়োটা আমাদেরকে
এখানে পাঠিয়েছে, হলাহপ নাচতে নয়।’

সোহানা তৈরী। রানার কথায় হেসে ফেললো ও। সামনে
এগিয়ে এসে বললো, ‘হলাহপ নাচে তো হাওয়ারাইয়ের মেয়েরা।’

রানা তাকালো সোহানার চোখের দিকে। চোখ দু’টো অন্ধ
কিছু দেখছে না বা বলছে না, শুধু রানাকেই দেখছে। রানা বুঝতে
পারছে, মেরেট মনে করছে, তারা তাদের জীবনের শেষপ্রান্তে
এসে দাঁড়িয়েছে। তাই মনের কথা বলার শেষ সুযোগটা চায় ও।

রানা ওকে কাছে টেনে নিয়ে খুব কাছ থেকে দেখলো। চোখ দু'টো তাকেই দেখছে। ভিজে আসছে, কিন্তু আবার হাসিতে ভরে যাচ্ছে। চোখ দু'টোর পাতা কাঁপছে। তারপর বন্ধ হ'য়ে এল। রানা ডাকলো, 'সোহানা!'—সোহানার হাত দু'টো আঁকড়ে ধরলো রানাকে। একমাত্র ভরসা এখন রানা।

সমুদ্রের তীর ধরে ছুটে চললো ওরা গ্লবল রহিতে। বস্টি ওদেফ সবকিছু থেকে আড়াল করে রাখলো।

রীপের দক্ষিণ দিকে বেড় মাইল এগিয়ে সমুদ্রে নেমে পড়লো ওরা। হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে লাইফ-বেষ্ট এ্যাডজাস্ট করে হেঁটে চললো গভীরের দিকে। কোমর পানিতে ওয়া কখনও হেঁটে কখনও সঁতারে এভাবে লাগলো। রানা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তার-কাঁটার বেড়া দেওয়া অঞ্চলটা হিসেব করলো। সমুদ্রের দূশ গজ ভেতরে গলা পানিতে পৌঁছে সঁতারে আরো দক্ষিণে এগিয়ে চললো। আগে আগে চললো রানা। শার্ক রিপেলেট সিলিগারের জু খুলে দিয়েছে ও। দুর্গন্ধময় কালো পদার্থ পানিতে মিশে যাচ্ছে। রানার বমি আসছিল গন্ধে কিন্তু এ গন্ধ শার্ককে দূরে রাখছিল রক্তের গন্ধ থেকে। শার্কের চেয়ে বমিই ভাল।

বস্টি কমে এসেছে।

সমুদ্রের উপর রাত্রির কালো ছায়া। রাত্রির সমুদ্রের কালো পানিতে ওরা আরো এগিয়ে চললো। রানা হিসেব করে অনুমান করলো, তার-কাঁটার বেড়ার আধ মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। এবার সঁতারের গতি ফেরালো তীরের দিকে। এবং গভীর অন্ধকারে দেখতে পেল সাদা বেলাভূমির রেখা। আরো কিছুদূর এসে ওরা দাঁড়ালো।

কোমর পানিতে ।

রানা কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। ধরে ফেললো সোহানা। এবং
থরে রাখলো। ও বুঝতে পারছে, রানার শক্তি নেই। লোনা পানিতে
জলছে কতটা। সোহানার কাঁধে হাত রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে
চারদিক দেখে নিলে সৈকতের দিকে এলো। দু'জনই হাঁপাচ্ছে।
সোহানা প্রাণণ চেষ্টা করছে রানাকে সাহায্য করার। সৈকতে এসে
দু'জনই আছড়ে পড়লো বালিতে। রানা চিত হয়ে শূন্যে কালো
আকাশের দিকে তাকালো। গভীর মেঘের আড়ালে চাঁদ কোথায়
আছে বোঝা যায় না। সোহানা উপর হয়ে শূন্যে পড়লো রানার
পাশেই। বললো, 'আমি ভাবিই নি যে, কোনোদিন কূলে উঠতে
পারবো।'

‘আমরাও ভাবি নি।’

গভীর কঠে সোহানার কথার সমর্থন করলো কেউ যেন অস্বকার
থেকে। দু'টো টেবের আলো একসঙ্গে এসে দু'জনের উপর পড়লো।
ওরা উজ্জল আলোর সোথ বন্ধ করলো। আবার শূন্যে পেল কঠস্বর,
'নিড়বেন না।'

দু'জন ভড়িং গতিতে উঠে বসলো। কেননা এতক্ষণে দু'জনের
খয়াল হল, যে কথা বলছে তার ভাষাও বাংলা। রানা সোহানার
কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সোহানা হতবাক হয়ে হাঁটুর
উপর ভর দিয়ে বসেই রইলো।

রানা আলোর উদ্দেশ্যে বাংলার বললো, 'আপনি আমাদেরকে
আগেই দেখেছেন?'

‘হ্যাঁ, কুড়ি মিনিট হলো আপনাদের ফলো করছি। কিন্তু কথা
বলার আগে পর্যন্ত বুঝি নি, আপনারা বাঙ্গালী।’—কঠস্বর আরো
এগিয়ে এল। বললো, 'আপনাদের নাম, পড়িচেন? তার আগে

জানা দরকার, আপনাদের সঙ্গে কোনো অস্ত্র আছে কিনা।’

রানা আলোর উৎসের পাশেই চকচকে পিস্তল দেখতে পেল। উত্তর দিল, ‘আমার কাছে এই ছুরিটা ছাড়া আর কিছু নেই।’—রানা ছুরিটা কোমরের বেঁট থেকে বের করে ভেজা বালির উপর ছুঁড়ে দিল। আলোটা সরে গেল ওদের চোখের উপর থেকে। রানা দেখলো সাদা নেভী-পোষাক পরা তিনজন লোক। বললো, ‘আমার নাম মাসুদ রানা, বাঙ্গালী। আপনারা কি নেভীর লোক?’

উত্তর এল, ‘আমি নেভীর সাব-লেফটেন্যান্ট সাদিকুর রহমান। আপনারা এখানে কি করে? জাহাজ ডুবির ঘটনা তো এখনো শূনি নি?’

কণ্ঠে দারিফের কাঠিন্য এনে রানা বললো, ‘ওসব কথা পরে বল। বাবে, লেফটেন্যান্ট। আমাদেরকে আপনার কম্যান্ডিং অফিসারের কাছে নিয়ে চলুন। এটা খুব জরুরী!’

‘কিন্তু একটা কথা...।’

‘আমি বলেছি, ব্যাপারটা খুবই জরুরী।’—রুঢ়ভাবে উচ্চারণ করলো রানা, ‘স্টার্টেনস দেখাবার অনেক সময় পাবেন। আপাততঃ আমার সঙ্গে কো-অপারেট না করলে আপনারাই বিপদ ডেকে আনবেন। আমি ইন্টেলিজেন্স লোক, আমার সঙ্গিনী মিস্ চৌধুরীও তাই। আপনাদের কম্যান্ডিং অফিসার কোথায় আছেন?’

হয়তো নেভী অফিসার রানার কণ্ঠের দৃঢ়তার জরুরী অবস্থার সূচকে পারলো। বিধাবিভভাবেই একটা দিক দেখিয়ে বললো, ‘মাইল দুয়েক যেতে হবে...কিন্তু আমাদের রাডার পোস্টে টেলিফোন আছে।’

‘কম্যান্ডিং অফিসারের নাম?’

‘কমোডোর জুলফিকার।’

রানা খুশী হয়ে উঠলো, বললো, ‘কমোডোর জুলফিকার? ম্যাসেক

পাঠিয়ে দিন আপনার সঙ্গীকে দিয়ে।’—রানা একটু ঝুহিয়ে নিয়ে বললো, ‘বলবেন, একটা আক্রমণ-পরিকল্পনা হচ্ছে বাইরে থেকে। হয়তো আজ রাতেই আক্রমণ ঘটবে। ডক্টর অলিন এবং তাঁর যে সহকারী পাহাড়ের অভ্যন্তরীণে বিজ্ঞান-সাধনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এত বছর থেকে, তাঁদের হত্যা করা হয়েছে সাত-আটদিন আগে।’

‘হ্যাঁ!’

‘আমার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।’—রানা বলে চললো, ‘রীপের অভ্যন্তরীণ থেকে পাহাড় কেটে স্ফুটন তৈরী করা হয়েছে এই দিকটা পর্যন্ত। মাত্র পাতলা একটা আবরণের আড়ালে রয়েছে সে স্ফুটন। ওরা যে কোনো মুহুর্তে ভেঙে ফেলবে সে আবরণ। হয়তো এতক্ষণ ভাঙা শুরু হয়ে গেছে। কান পাতলে গাইতির শব্দ শুনতে পাবেন।’

বিস্ফোরিত হল লোকটার চোখ দু’টো। পাহাড়টা দেখলো। রানা জিজ্ঞাসা করলো, ‘কত লোক আছেন আপনারা?’

‘চব্বিশ জন সিভিলিয়ান। নেভীর লোক আছে পঞ্চাশ জন,’

‘আর্মড?’

‘হ্যাঁ।’

‘তবে তাড়াতাড়ি করুন। হ্যাঁ, কমোডোরকে বলবেন, আমার নামটা মাসুদ রানা, মেজর মাসুদ রানা।’

লেফটেন্যান্ট তার সহকারীকে নির্দেশ দিল। লোকটা চাইনিজ নেভীর। দ্রুত চলে গেল অস্ত্রকারের ভেতরে নির্দেশ শেষ হবার আগেই।

‘দু’দেশের-নেভী কি এক সঙ্গে কাজ করছে?’

‘কোনো প্রশ্ন করবেন না, মেজর মাসুদ।’—লেফটেন্যান্ট সাদিক বললো, ‘আমরা কি এখন কমোডোরের কাছে যেতে পারি, মেজর মাসুদ?’

...কিছু মনে করবেন না, আমাদের পেছনে লিডিং সী-ম্যান কাও-চী আসবে। আপনি এখনো অফিসিয়ালী অবস্থিত অনুপ্রবেশকারী।’

কাও-চী তার হাতের কারবাইন উঁচু করে ধরে রেখেই পেছনে চলে গেল। রানা সোহানার দিকে তাকালো এতক্ষণে। ডান হাতে ওর কনুই ধরে বললো, ‘চল।’—ঝুঁকে কানের কাছে বললো, ‘ভয় নেই। কমোডোর জুলফিকার আমাদেয়ই লোক।’

হাসান চেষ্টা করে পা বাড়ালো সোহানা। ওদের পাশেপাশে চললো সাদিক, পেছনে কারবাইনধারী কাও-চী।

‘লেফটেন্যান্ট!’

কাও-চীর ঝুঁটে ফিরে তাকালো লেফটেন্যান্ট সাদিক। কাও-চী বললো, ‘এই ভুললোক আহত। একটু বেশি রক্তের।’

রানা দেখলে, দরদর করে কাঁচা রক্ত ক্ষত থেকে বের হয়ে শার্টের পুরো বাঁ হাতাটা লাল করে দিয়েছে। লেফটেন্যান্ট সাদিক ভালো করে দেখলো টর্চ আলো। কিন্তু বাজে দুঃখ প্রকাশ না করে বললো, ‘শার্টের হাতাটা ছিঁড়ে ফেলি?’

‘শার্টের হাতা ছিঁড়বেন, ছিঁড়ুন।’—রানা এতক্ষণে যন্ত্রণাটা অনুভব করলো। বললেন, ‘কিন্তু আমার হাতটা ছিঁড়বেন না, প্রীজ।’

লেফটেন্যান্ট কাও-চীর ছুঁড়িটা নিয়ে কেটে ফেললো হাতাটা। ক্ষত দেখে বললো, ‘ফসফেট ক্যাম্পের বন্ধুদের কীতি?’

‘হ্যাঁ, ওদের কুকুরটা বড় বেশি পোষমানা।’

‘এভাবে রেখেছেন কেন?’

‘তা ছাড়া লুকিয়ে রাখার উপায় ছিল না।’

‘কিন্তু...’—লেফটেন্যান্ট ভাল করে দেখে বললো, ‘যে কোন মুহুর্তে এটা গ্যাংগ্রিনে রূপ নিতে পারে।’

‘গ্যাংগ্রিন।’—আর্তনাদ করে উঠলো সোহানা।

‘ভয় নেই।’—লেফটেন্যান্ট বললো, ‘কাছেই নেভীর ডাক্তার আছে।’
—বলেই ঠুট্টো সোহানার হাতে দিয়ে নিজের শার্টটা খুলে ফেলে
ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজের মত লম্বা কাপড় বের করে জড়িয়ে দিল ক্ষতে।
বললো, ‘আধ মাইল পরেই সিভিলিয়ানদের কোয়ার্টার। ব্যাণ্ডেজ
করলেই রক্তপাত কমবে। এটুকু কষ্ট করে হাঁটতেই হবে।’

রানা তাকালো তরুণ নেভী অফিসারের বুদ্ধিদীপ্ত মুখের দিকে।
বললো, ‘ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট সাদিক।’

মিনিটদশেক হাঁটার পর ওরা পৌঁছুলো লম্বা এক সেডের সামনে।
কোথাও আলোর নিশানা নেই। লেফটেন্যান্ট নক করলো একটা
ঘরের দরজায়। এবং ধাক্কা দিয়ে খুলে অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে
সুইচ টিপে একটা বাতি জ্বালালো। ওরা আলোকিত সবু প্যাসেজ ঘরে
ঘরে এল। ঘরটা টেবিল-চেয়ারে সাজানো। ঝকঝকে, তকতকে, হোট-
খাট অফিস। লেফটেন্যান্ট ওদেরকে বসতে বলে টেবিলের উপর থেকে
ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে জেনারেটরের ছাওলে কয়েকটা পাক
দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলো বিরক্তির সঙ্গে। বললো, ‘ডেড, ঢাকার
টেলিফোন সিস্টেমের মত, যখন দরকার তখনই ডেড!’—তাকালো কাও-
চীর দিকে। বললো, ‘তোমাকে কষ্ট করতে হবে কাও-চী। সার্জন
লেফটেন্যান্ট সেন-চিয়াংকে খবর দাও। খুলে বলবে সব ঘটনা। ওখান
থেকে ক্যাপ্টেনের কাছে যাবে বলবে আমরা আসছি।’

কাও-চী পা ঠুকে বের হয়ে গেল।

রানার চোখ ক্রান্তিতে বদ্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু পুরো ঘটনাটা
মনে করে ধুমবিহীন করলো চোখ। রানা বা সোহানা কোনো কথা
বললো না। এমন সময় আরো একজন ঘরে প্রবেশ করলো। লেফটেন্যান্ট
বললো, ‘বালো, ডক্টর খান।’

রানা চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, সেলিম

খান। পরনে জেসিং গাউন, হাতে সিগারেট। সেলিম খান লেফটেন্যান্টের সম্ভাষণের উত্তর দিতে গিয়ে থমকে রানার মুখের দিকে তাকালো। তারপর তার চোখ দু'টো ছোট হয়ে গেল। বিস্ময় ফুটে উঠলো। বলে উঠলো, 'রানা! মাসুদ রান', মাই ডিয়ার ইয়ং ম্যান!'

'ডক্টর খান!'—রানা বললে, 'হঁ', মাসুদ রানা, আপনার খোঁজেই এলাম।'—কান্দীয়ে সেই দেখেছিল, আবার আজ দেখছে—কিন্তু ডক্টর খান একটুও বদলে যান নি।

বাহে এগিয়ে এলেন ডক্টর খান। রানাকে ভাল করে দেখলেন। বললেন, 'এ অবস্থা কেন?'—সোহানার দিকে ফিরে তাকালেন। হাসিটা আরো বিগ্ন হল, বললো, 'কে, তোমার স্ত্রী?'

রানা দেখলো সোহানাকে। বললো ওর দিকে চেয়ে চেয়েই, 'এক্স-মিসেস মাসুদ রানা। এখন সোহানা চৌধুরী!'

'আপনি মিস্টার মাসুদকে চেনেন?'—ওদের কথার মাঝখানেই কর্তব্য-পরায়ণ লেফটেন্যান্ট জিজ্ঞেস করে বসলো ডক্টর খানকে।

'রানাকে চিনবো না!'—অবাক হয়ে তাকালেন লেফটেন্যান্টের দিকে। বললেন, 'মাসুদ রানা আমাকে দেশে নিয়ে এসেছিল শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে। আমার আজও মনে আছে...'—স্মৃতি-চিত্রণ করতে গিয়ে থমকে গেলেন ডক্টর। বললেন, 'সেটা না বলাই ভাল...কি বল, রানা? অফিসিয়াল সিক্রেট!'—তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি গোপন কাজে এলে? হয় তুমি বিপদের পিছনে ছোট, অথবা বিপদ তোমার পিছনে ছোট।'।

'এসেছি সলিড ফুয়েল এক্সপার্ট' হিসেবে। আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে।'।

'সলিড ফুয়েল এক্সপার্ট?'—ডক্টর খান জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি হচ্ছে, তুমি জানো?'

‘নতুন ধরনের রকেট ?’

‘হ্যাঁ।’—চিন্তিত দেখলো ডক্টরকে। বললো, ‘একজন ফুয়েল এক্সপার্ট আজ এসে পৌঁছানোর কথা। তুমি কি সত্যি সত্যি ফুয়েল এক্সপার্ট হিসেবে এসেছো ?’

লেফটেন্যান্ট বললো, ‘মেজর মাসুদ ও মিস্ চৌধুরীর কাপড় ছাড়া দরকার। আমি এখানকার সবাইকে খবর দিয়েছি। তাঁরা কনফারেন্স রুমে বসেছেন। আপনার পুরো কাহিনীর সবার সামনে বলাই ভাল।’

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবার সঙ্গে মিলিত হন রানা। টেবিলে ছইকির বোতল রাখা হয়েছে। রানা গ্রাসে কিছুটা ঢেলে নিল। ওরা এগারো জন। চারজনের মোজলীয়ান চেহারা। দু’জন ইউরোপীয়ান। সবাই পরিচয় দিল না। বাইরের লোকের কাছে হঠাৎ পরিচয় ওরা দিল না। বলতে শুরু করলো রানা, নিজের পরিচয় শেষ করেই, ‘আমি খুব সংক্ষেপে বলবো এখানে আসার ঘটনা।’—বলে দু’মিনিটে স্মৃষ্টির কথা শেষ করলো। বললো, ‘স্মৃষ্টি-পথে ওরা যে মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে।’—বলে সবার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, ‘আপনাদের মধ্যে ডক্টর বরকত উদ্দাহকে দেখছি না। হাতে তার হৃৎস্পন্দ দেখা যায় নি। তাঁর ভাগ্যে কি ঘটেছে বলে আপনাদের মনে হয় ? হত্যা ?’—রানা নারীকণ্ঠের সঙ্গীতের কথা বাদ দিল। কারণ ওঁরা ভেঙ্গে পড়বেন।

‘ডক্টর বরকতের জী হঠাৎ মারা যান ম্যানিলায় ! তারপর তিনি পাগল হয়ে যান।’—বললেন বিষয় ডাঃ সেলিম খান।

‘এখন কোথায় আছেন ?’

‘আমরা জানি না। তবে সবাই অনুমান করে, হয়তো সমুদ্রে,

হাজরের পেটেই গেছেন।’

‘তাও যেতে পারেন।’—রানা বললো, ‘আপনাদের আরেকটি খবর দিচ্ছি। আমার ধারণা ছিল, আপনাদের জীরা আপনাদের সঙ্গেই আছেন। কিন্তু সে ধারণা পাঠাতে বাধ্য হয়েছি কিছুক্ষণ আগে। কারণ আপনাদের জীরা এখানেই বন্দী, ওই গুহায়।’

‘অসম্ভব!’—একজন বললো, ‘আজও আমার জীর চিঠি পেয়েছি ম্যানিলা থেকে।’

‘অসম্ভব হলে আমিও খুশী হতাম।’—রানা বললো, ‘আপনাদের জীরা ম্যানিলাতে ঠিকমতই ছিলেন। এখন তাঁরা সবাই এখানে গুহায় বন্দী। আমি এখানে এসেছি তার কারণ হয়তো আপনাদের জীদের নির্বোধ হওয়ার ঘটনাও একটা। হয়তো বলছি এখানে যে, কোন ঘটনা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। শুধু ডক্টর বরকত উল্লাহ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা গিয়েছিল। আপনারা চিঠি-পত্র পান, কিন্তু চিঠিগুলো পিস্তলের মুখে রেখে তাঁদের দিজে লেখানো হয়ে থাকে বলে আমার বিশ্বাস। আপনাদের সন্দেহ হলে পরস্পরের চিঠি মিলিয়ে দেখুন। হয়তো দেখবেন চিঠিগুলোর কাগজ একই, কালিও এক। হয়তো ভাষাও ...।’

সবার মুখই শুকিয়ে গেছে। তারা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে।

ডক্টর সেলিম খান বললেন, ‘এখন আমাদের প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তোমার কথায় আমরা বিশ্বাস করি। কারণ ডক্টর বরকত উল্লাহও এ ধরনের কথা বলতেন পাগল হয়ে গিয়ে।’—ডক্টর খান বলতে লাগলেন, ‘আমরা এগারো জন আছি এখন। আগে ছিলাম বারোজন। এর মধ্যে চারজন কমিউনিস্ট চাঙ্গনার। বাকী সবাই বিদেশী। ইউরোপ ও এশিয়ার বহু রাষ্ট্রের। আমরা এখানে আসবো ঠিকই ছিল। ইংল্যান্ড বা পশ্চিম জার্মানীর লোক যারা আছেন

তারাও কমিউনিস্ট। এঁদের সঙ্গে চারনা গোপনে চুক্তি করে। এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর। তার কারণ হচ্ছে, আমরা প্রত্যেকেই যে দার দেশের বিখ্যাত লোক। দেশের বাইরে হঠাৎ চলে গেলে সংবাদ-পত্র হেঁচকিতে করতে পারে—তাই বিজ্ঞাপন দিয়ে কাগজের মুখ বন্ধ করা হয়। আমরা ম্যানিলা এয়ার-পোর্টে গা-ঢাকা দিই। আমাদের জীরা যথাস্থানে পৌঁছে যায়। তারা এ ব্যাপারে অভ্যস্ত। কারণ এরকম গোপনীয় কাজ আমরা অনেক করে থাকি। এখানে এসে আমরা চারজন চাইনিজ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিকল্পনা মত কাজ শুরু করি। এরই মাঝখানে হঠাৎ ডঃ বরকত উল্লাহ উর্টোপার্টো কথা বলতে থাকেন। বলেন, কোথাও কিছু একটা ঘটেছে। আমরা তাঁর কথা উড়িয়ে দেই। তারপর তাঁর জীরা যত্ন-খবর আসে। ডক্টর বরকত উল্লাহ বন্ধ পাগল হয়ে যান।’

‘আপনারা ডক্টর অলিনকে চিনতেন?’—রানা জিজ্ঞেস করে।

‘চিনতাম। ডক্টর বরকত উল্লাহকে ডক্টর অলিনের সঙ্গে প্রায় দেখা যেত। ওরা নাকি আগের পরিচিত ছিলেন।’—কথাটা বলতে গিয়ে ডক্টর খান আরো চিন্তিত হয়ে পড়েন।

‘ক্যাপ্টেন দিউ বলে কাউকে চিনতেন?’—রানা জিজ্ঞেস করে।

‘সিকপ্যাটারের ক্যাপ্টেন দিউ এখানে আসে সপ্তাহে দু’দিন।’—বললো লেফটেন্যান্ট সাদিক, ‘আমাদের মেইল এবং খাবার আনা-নেওয়া করে। ইন্দোনেশীয় কমিউনিস্ট। এখন কম্বোডিয়ায় অধিবাসী।’

‘এখানে কি হচ্ছে, ও জানে?’

‘না। ও জানে, এখানে আমরা তেল বা ঐজাতীয় কিছু অনুসন্ধান করছি।’—লেফটেন্যান্ট বললো, ‘আমরা যা করছি তা এখানকার বিজ্ঞানী এবং দু’দেশের নেভী ছাড়া কেউ কিছু জানে না। দু’দেশের

‘নেভীর টপ সিক্রেট প্রজেক্ট ।’

‘আমরা মনে হয় এখন আমাদের জীদেব কথ্য ভাবেতে পারি ।’ বললো
ব্রিটিশ এজেন্ট ।

রানা বললো, ‘হ্যাঁ, সেটাই ভাবা উচিত । কারণ ওরা বৈজ্ঞানিকদের
জীদেব সবার আগে হাতের মধ্যে রেখেছে এখানে আক্রমণ চালাবে
বলেই । আমরা মনে হয়, ওরা এতক্ষণ সুরঙ্গের শেষপ্রান্ত ভাঙা শুরু
করেছে । আমরা এখন এক কাজ করতে পারি, নৌকায় করে বীপের
ওপাশে গিয়ে ওহার ওপাশের মুখ দিয়ে ঢুকে সুরঙ্গের মুখ বন্ধ করে
দিতে পারি ।’

‘আমাদের এখানে কোনো নৌকা নেই ।’—লেফটেন্যান্ট সাদিক
জানালো ।

‘নেভীর নৌকা নেই ।’

‘আমাদের ক্রুজার ছিল । আমাদের নেভীর ক্রুজার এখন এখান
থেকে দেড় শো মাইল দূরে পর্যবেক্ষণের জন্যে গেছে । গতকাল নেভীর
নির্দেশে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ফায়ারিং রেজে । আজ আমাদের ফুয়েল
এজেন্ট আসার কথা । আজ রকেট টেস্ট হবে, তাই ক্রুজার সানিয়ার
নিম্নে কমোডোর সিং ও সেরে গেছেন গতকাল সকালে । কমোডোর
সিং হচ্ছেন এই প্রজেক্টের চাইনিজ প্রতিনিধি । আর ডক্টর আছেন
পিকিং ডাকের চার্জে... ।’

‘পিকিং ডাক ?’

‘রকেটের নাম ।’

রানা বুঝতে পারছে, ডক্টর অলিনের সঙ্গে যোগ আছে পিকিং-এর
কোন বিশ্বাসঘাতক সংস্থার । রানা বললো, ‘লেফটেন্যান্ট সাদিক,
এখনি আমাদের দেখা করা দরকার কমোডোর জুলফিকারের সঙ্গে ।’

দরকার নক হল ।

লেফটেন্যান্ট সাদিক বললো, ‘কাম ইন ।’

দরজা খুলে গেল । ওখানে দাঁড়িয়ে লিডিং সী-ম্যান কাও-চী । কাও-চী শুনলো মেকানিক্যাল গলায় বললো, ‘ভাজার এসেছেন ।’—দৌড়ে এসেছে বলেই হয়তো কথা বলতে পারছে না ।

‘আসতে বল ।’—লেফটেন্যান্ট হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, ‘তোমার কারবাইন কোথায়, কাও-চী ?’

দুপ্ করে একটা শব্দ হল । কাও-চী আতঁনাদ করে উঠে বেঁকে গেল পিছনের দিকে—তারপর বসে পড়লো । হাঁটুতে, হাড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে । সবাই ব্যাপার বোঝার আগেই দেখলো, দরজায় দাঁড়িয়ে একটা দানব-মূর্তি ।

ওয়াং ! ভাবলেশহীন মুখশ্রী । হাতে ধরা সাইলেন্সার লাগানো মেশিন পিস্তল । লেফটেন্যান্ট সাদিকের হাত মুহূর্তে চলে গেল পিস্তলের খোঁজে । রানা নিষেধ করতে গেল সাদিককে । কিন্তু তার আগেই ওয়াং-এর পিস্তলে আরেকটা আওয়াজ হল । লেফটেন্যান্ট সাদিক গাড়িয়ে পড়লো মাটিতে ।

ওয়াং নিষিকার । টুংগারে হাত রেখে এগিয়ে এল তিন পা । তাকালোও না সাদিকের দিকে । সবারই চোখ ওয়াং-এর ভাঙা-চোরা মুখের ওপর নিবদ্ধ । মুখ থেকে ধ্বনিত হল কয়েকটা কথা, ‘কারো কাছে কোনো অস্ত্র থাকলে ফেলে দিন । সার্চ করে যদি কারো কাছে অস্ত্র পাওয়া যায় তবে তাকে হত্যা করা হবে ।’

কেউ কোন অস্ত্র ফেললো না । কারো কাছে কিছু নেই, রানা বুঝতে পারছে । রানা তাকালো সোহানার দিকে । সোহানা এখনকারই কারো শার্ট-প্যাণ্ট পরেছে । পুঙ্খবশের পোষাকের ভেতরে ও হারিয়ে গেছে । কিন্তু তবু ভালো লাগছে ওকে, পরিচ্ছন্ন লাগছে গোসলের পর । এতকণ্ণ ওকে দেখে নি । ও রানার দিকেই চেয়ে আছে ।

হঠাৎ রানা দেখলো, ওর চোখে ভয়। ওয়াং-এর পিস্তলের মুখ রানাক দিকে উদ্ভত। ওয়াং বললো, ‘আমাদের বড় একটা চাল মেরেছেন! আমাদের গুলফকে খুন করেছেন, খুন করেছেন আমাদের সেরা দু’জন লোক। আপনাকে এর জন্তে ভুগতে হবে।’

ওয়াং বাঁ হাতের ইশারা করতেই রানার দু’পাশে দু’জন এসে দাঁড়ালো।

৮

ওয়াং বললে, ‘প্রতিশোধ আমি নেবোই। আর আপনিও জানেন, হত্যার প্রতিশোধ হত্যাই।’—ওয়াং ইংরেজীতে কথাগুলো বলছে অথচ ওর মুখে একটা মামুল কাঁপছে না। চোখ দু’টো শুধু স্থির রানার উপর। বললো, ‘আমি মাত্র একজনই আপনাদের পাহারায় রেখে যাচ্ছি। একজন বলে হেলা-ফেলা করবেন না। এর নাম হাং। ভিয়েতনাম যুদ্ধে এই সাতদিন আগেও সার্জেন্ট-মেজর ছিল মেশিনগান ব্যাটেলিয়ানের। ওর হাতের টমীগানের একটা গুলিও দেওয়ালে লাগবে না, যদি ওকে ডিস্টার্ব করেন।’—একটু হাসি দেখা গেল ওয়াং-এর ঠোঁটের বাঁ কোণে, কি হাসি তার কোন ব্যাখ্যা নেই। বললো, ‘আমি জানি উত্তর মাসুদ, আপনি অনুমান করতে চেষ্টা করছেন, ভিয়েতনামে ও কোন্‌পক্ষে যুদ্ধ করেছে? অনুমান করুন, সময় কাটবে

ভাল। আর একটা কথা, বুঝতেই পারছেন, টেলিফোন লাইন নেই।
পুরো হীপটা এখন আমাদের দখলে।’

ওয়াং ও অপর একজন বের হয়ে যেতেই সবাই রানার দিকে
তাকালো। রানা হ্যাং-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো ‘আমরা
আরাম করতে পারি?’

একটু ভাবলো হ্যাং। বললো সব্যর উদ্দেশ্যে, ‘আপনারা সবাই
আরাম করে বসতে পারেন। কথা বলতে পারেন, সিগারেট পান
করতে পারেন। তবে ফিসফিস করবেন না। আমি কাউকে কিছু
করবো না। ডক্টর মাসুদ, কোন চাল চালবেন না।’

রানা ওর কথায় কান না দিয়ে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।
সোহানা দ্রুত সরে এল রানার কাছে। রানা কিছু বললো না, শুধু
হাতটা ধরলো। ওর জন্তে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল ডক্টর খান।
বৈজ্ঞানিকদের চোখ এখন লেফটেন্যান্ট সাদিকের উপর।

‘রানা,’—সোহানা কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, ‘কি ভাবছো?’

‘ভাবছি, এবার একটা ভুল চাল দিয়েছে ঢাকার ওই বুড়ো।’—
রানা চোখ বুঁজেই বললো, ‘নইলে এত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে
পড়বো কেন?’

রানার আরেক পাশের চেয়ারে এসে বসলো ডক্টর খান। বললো,
‘রানা, একটা ব্যাপার বুঝলাম না, ওরা তোমাকে ডক্টর মাসুদ বলে
কেন?’

হাসলো রানা। বললো, ‘এখানে আমি আপনাদের মতই একজন
বিজ্ঞানী। সলিড ফুয়েল টেকনোলজিস্ট। ওরা আমাকে হত্যার কথা
বুঝেই বলুক না কেন, হত্যা করতে পারবে না, কারণ আমার প্রয়োজন
ওদের আছে।’

‘তুমি...!’—থেকে গেল ডক্টর, বললো, ‘তুমি পারবে?’

‘কি?’

‘ফিউজ লাগাতে—রকেটে?’

‘তাই ভাবছি।’—রানা বললো, ‘দায়িত্বটা কম নয়। অথচ আমি বিশ মিনিট আগেও এই রকেটের খবর জানতাম না, ডক্টর খান।’—সোজা হয়ে বসলো রানা। জিজ্ঞেস করলো, ‘ডক্টর খান, এ রকেট নিয়ে অত গোপনীয়তা কেন?’

‘কারণ নিশ্চয়ই আছে।’—ডক্টর খান বললে, ‘আমাদের দেশ আন্তঃদেশীয় রাস্টিক মিশাইল আজও তৈরী করতে পারে নি। অথচ এটা প্রয়োজন। পশ্চিমা শক্তি জোট দিতে পারতো’, কিন্তু তাতে দেশের ভেতর-বাইরে প্রতিবাদ উঠবে। এসব জিনিসে অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হওয়া যায় না এই যুগে। পাকিস্তানের মত গরীব দেশের পক্ষে এর স্বপ্ন দেখা মানে হেঁড়া কাঁথায় শূয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন। বিরাট প্রজেক্ট, বিরাট এলাকা জুড়ে বিরাট আকারের রকেট তৈরীর কথা চিন্তা করা আত্মহত্যার নামান্তর। কারণ যেখানে এটাকে স্থাপিত করার কথা হবে, শত্রু রাষ্ট্রের আক্রমণ-পরিকল্পনা রচিত হবে সেখানটাকে কেন্দ্র করে। তাই আমাদের দেশ আবহাওয়া রকেট ছাড়া অস্ত্র কিছুই চিন্তা করে নি কোনোদিন।’

একটু ভেবে ডক্টর খান বলতে লাগলো, ‘কিন্তু চিন্তা করেছিল ডক্টর বরকত উল্লাহ। আপনি জানেন, রকেটে ফ্যুয়েল সমস্যা হচ্ছে একমাত্র সমস্যা। এখনো আমেরিকায় লিকুইড অক্সিজেন চালিত রকেট তৈরী হয়। অবশ্য লিকুইড হাইড্রোজেনকে 423° F বয়েলিং পয়েন্টে দগ্ন ভাগ ঘন করে ব্যবহার হচ্ছে তবু রকেট খুব ছোট হয় নি। ওয়া cesium এবং iron ব্যবহার করছে কুরেল হিসেবে। হাজারোটা ফর্ম রিসার্চ চালাচ্ছে। কিন্তু রকেটের ছোট আকারের মডেল কেউ দিতে পারছে না, যা অনায়াসে স্থানান্তরিত করা যায়।

ডক্টর বরকত উল্লাহ রিসার্চ চালান এই জিনিসটাকে খেলাল রেখে : ছোট এবং মুভেবল। আর তিনি তাঁর রিসার্চের ফলও পান। এই রিসার্চ থেকেই পরিকল্পনা রচনা করেন সলিড ফুয়েল-চালিত রকেটের জন্তে কোন নির্দিষ্ট ভূমির প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে মত এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যাবে। এর শক্তি যে কোনো লিকুইড ফুয়েলের চেয়ে বিশগুণ বেশি।

‘ডক্টর বরকত উল্লাহ এটাকে পরীক্ষা করেন বেলুচিস্তানের মরু-ভূমিতে খুব ছোট আকারে। আমাদেরও ডাকা হয়েছিল। বিশেষ ভাবে নির্মিত আটাশ পাউণ্ড ওজনের রকেটটি নিক্ষেপ করেন। প্রথম তাঁর কথামত খুব ধীরে উঠতে থাকে, তারপর হঠাৎ গতি পায়। আমরা রাডারে ৬০,০০০ ফিটের পর আর ওটাকে দেখতে পাই না। তখন এর গতি ছিল ঘণ্টায় ১৬০০০ মাইল। সরকার বিষয়টিতে অতি মাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠে। এর বিশাল ব্যয়ভার বহন এবং আরো কিছু টেকনিক্যাল উন্নয়ন সাধনের জন্তে চায়নার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ডক্টর বরকত উল্লাহ ইটরোপের দু’জন বিজ্ঞানীকে নির্বাচন করে আরো কতকগুলো বিষয়ে উন্নয়নের জন্তে। আমাদের দেশ থেকে আমি এসেছি—চায়নার আছে চারজন। বরকত উল্লাহ মিনিয়-চার রকেটকে ৪০০ গুণ করে নির্মিত হচ্ছে বর্তমানের ‘পিকিং ডাক’। এর সর্বোচ্চ গতি হবে ঘণ্টায় ২০,০০০ মাইল। এটা দু’টন ওজনের একটা বসকে ছ’হাজার মাইল দূরত্বে নিয়ে ফেলবে ১৫ মিনিটে। এর সবচে’ বড় কথা হচ্ছে, এটাকে নিক্ষেপ করা যাবে যে কোনো জায়গা থেকে। ছোট আকারের জাহাজ, ট্রেন, সাবমেরিন এমনকি একটা ট্রাক, সেখান থেকে হচ্ছে।’—উজ্জল হয়ে উঠলো ডক্টর খানের মুখ এবং সঙ্গে সঙ্গেই মাথা নিচু করলো। বললো, ‘কিন্তু এখন ওটা ওদের হাতে।’

‘ওরা কারা?’—রানা জিজ্ঞেস করলো ডক্টর খানকে নয়, নিজেকেই ।
ডক্টর খান উত্তর দিলো না, প্রশ্নটাই করলো, ‘কারা হতে পারে?’

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, দিন হয়ে গেছে। লাল হয়ে
গেছে লেফটেন্যান্ট সাদিকের বেঁধে দেয়া ব্যাণ্ডেজটা। রানা দেখলো
কোথা থেকে এক টুকরো রোদ এসে পড়েছে কৃত সাদিকের মুখে ।
সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রান্তিতে ভরে এল চোখ ।
টেবিলের উপরের আধ-খাওয়া হুইস্কির গেলাসটা দেখে তুলে নিল ।
সবার দিকে তাকিয়ে বললো, ‘চিন্নাস’ ।—কেউ রানার কথার উত্তর
দিল না । এমন কি সোহানাও না ।

এমন সময় হরে এলো ওয়াং । ওর কপালের কালোশিরে পড়ু
দাগটা রানার চোখ এড়ালো না । গত রাতটা বেচারার ভাল ঝাল
নি, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে । আরো বোঝা গেল চাউনিতে ।
হাং-এর হাত থেকে কারবাইনটা প্রায় ছিনিয়ে নিল । ছোট শব্দট
উচ্চারণ করলো হৃৎকের ভাবের কোনো পরিবর্তন না করে, ‘আউট ।’

সবাই লাইন করে বের হয়ে এল ।

রানা দিনের আলোর দেখলো, একটি গাছও নেই এদিকটায় ।
একদিকে পাহাড় প্রায় খাড়া । তাকে তাকে কিছুদূর উঠে—একেবারে
খাড়া ।

মাথার পেছনে হাত বেঁধে কৃত হাঁটতে হচ্ছিলো ওয়াং-এর
পিছনে পিছনে । সবার পিছনে হাং ধরে রেখেছে অটোমেটিক
কারবাইন । ওয়াং ওদের উত্তর-পশ্চিম কোণে নিয়ে চলেছে ।

‘তিন শ’ গজ আসার পর রানা দেখতে পেল সেই শুষ্ক-মুখ
নতুন ভাঙা হয়েছে । আজ ভোর রাতে । এদিক দিয়েই ওরা প্রবেশ
করেছে । রানা আশে-পাশের চিত্রটা মনের মধ্যে এঁকে নিতে চেষ্টা
করলো ।

পাহাড়েরই একটা পাথরের তাকের উপর দিয়ে হাঁটছিলো রানারা। এবার অপেক্ষাকৃত উঁচু তাকে উঠলো। দেখতে পেল সামনে পশ্চিমের সমতল। এখানে এখনো সূর্য ওঠে নি। পাহাড়ের ছায়ায় সমতল ঘন এখনও ঘুমুচ্ছে।

এ অংশটা পূর্বের সমতলের চেয়ে অনেক বড়। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার এক মাইলের মত হতে পারে। সমুদ্র থেকে পাহাড়ের প্রথম ধাপের দূরত্ব হাজার বা বারো শ' ফিটের মত। এখানেও গাছের নিশানা নেই। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের লেগুন সূর্যের আলোয় চক্‌চক্‌ করছে। প্রবালের তিবিঙলো মাথা বের করে আছে সমুদ্রে। তার ওপাশে সমুদ্রের ভিতরে চলে গেছে একটা পাটাতন—জেটি। জেটিতে একটা ক্রেন, বিরাট আকারের ক্রেন। রানা অনুমান করলো, ফসফেট কোম্পানীর ফেলে যাওয়া সম্পত্তি। এখানে নেভী-ঘাট বেছে নেয়ার পিছনে ওই ক্রেনও একটা কারণ।

পাটাতনের উপর দিয়ে চলে গেছে রেল-লাইন। লাইন এসেছে বীপের পূর্বদিক থেকে। কিন্তু মাঝখানে লাইন ভুলে ফেলা হয়েছে। নতুন লাইন এদিকে একটু পশ্চিমে চলে গেছে। নতুন লাইনের মধ্যবর্তী স্থানে একটা গোলাকার ছাদবিশিষ্ট আস্তানা—হ্যাঙ্গার। লাইন শেষ হয়েছে হ্যাঙ্গারের কাছে, একটা বাড়ির সামনে। বাড়ি'সু আই ভিউতে বোঝা যাচ্ছিল না বাড়িটা কত উঁচু। বাড়ির হ্যাঙ্গার সাদা রং করা। কিন্তু চক্‌চক্‌ করছে না। রানা অনুমান করলে', এটার ছাদ আসলে লোহার তৈরী। তার উপর সাদা রঙ করা ক্যানভাস বিছানো হয়েছে।

আরো কিছুটা উত্তরে দেখা গেল জন-বসতি। অনেকগুলো ছোট ছোট বাড়ি। আরো উত্তরে একটা চৌকো কংক্রিটের চত্বর দেখতে পেল। বোঝা গেল, ওটা কি। ওটার উপরে গোটা ছয়েক বিভিন্ন

আকারের এ্যান্টেনা দেখা গেল। ওটা কন্ট্রোল-রুম। স্বাক্ষর থেকে লাইন চলে গেছে উত্তরের দিকে, গোলাকার লাইজিং প্যাড।

ওয়াং ওদেরকে নিয়ে গেল ছোট বাড়িগুলোর দিকে। দাঁড়ালো একটা অসমাপ্ত বাড়ির সামনে। দু'জন লোক গার্ড দিচ্ছে বাড়িটা ওয়াং-এর লোক। ওদের একজন দরজা খুলে দিল। কোনো কথা না বলে এবং বিজ্ঞানীদের ইশারা করে ভেতরে ঢুকে গেল।

যে ঘরটার ওরা এল সেটা একটা হল-ঘরের মত। ঘরের মাঝখানে টেবিল জোড়া দিয়ে একটা লম্বা টেবিল করা হয়েছে। টেবিলের তিন দিকের বেঞ্চ বসেছে গোটা ত্রিশেক নেভীর লোক। চেহারায় দেখে সহজেই অনুমান করা যায়—কে কোন দেশী।

রানা দেখলো, কমোডোর জুলফিকার বাঁ হাতের তালুতে কপাল ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন যেন। নেভীর কারো চোখে-মুখে ভয় নেই, উত্তেজনা নেই। অথচ সবার মুখই রক্তাক্ত, ইউনিফর্মের রক্তের ছোপ। বোঝা যায়, সারা রাতই প্রায় এদের উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। ঘরের চারদিকে গোটা কয়েক লোক দাঁড়িয়ে অটোমেটিক কারবাইন হাতে নিয়ে। কমোডোর জুলফিকার চোখ তুলে তাকালো। চেনা যায় না তাকে। চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। তার পাশেই রয়েছে দু'দেশের নেভীর হাই র‍্যাঙ্কিং অফিসার।

‘অলিন’ টেবিলের একধারে বসে আছে। স্থিরভাবে চুরোট টানছে। হাতে পিষ্টল নেই, তবে সেই মালাক্কা বেতের ছিটিটা আছে। চোখের রোল-গোল্ডের চশমা ছাড়া মেক-আপের কোনো পরিবর্তন দেখলো না। অথচ চোখ দু'টো বের হয়ে পড়াতে একে সম্পূর্ণ অন্ধ লোকই মনে হচ্ছে। রানাকে দেখলো স্থির চোখে। এত স্থির চোখ

একমাত্র পাথর লাগানো দৃষ্টি-হীনেরই সম্ভব।

পাশে বসা কোচিমা। আধুনিক পোষাকে।

ওয়ার-এর দিকে চেয়ে অলিন বললো, 'ঠিক আছে সব?'

সবাই তাকালো বিজ্ঞানীদের দিকে। কমোডোর ঠোট খুলতে গেল রানাকে দেখে। রানার স্থির চোখ তাকে ধামিয়ে দিল।

অলিন ছড়ি দিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা এক তরুণ চাইনিজ নেভী অফিসারের লাশ দেখালো। কলার ধরে লাশের মাথাটা একটু তুলে ছেড়ে দিল ওয়ার। সবার চোখ তরুণ অফিসারের হৃত ক্ষতবিক্ষত মুখের উপর আটকে রইলো।

উঠে দাঁড়ালো অলিন। স্বগত উজ্জ্বল মত করেই বললো, 'হতভাগ্য কমিউনিস্ট। ওর কাছে জানতে চেয়েছিলাম অস্ত্রাগারটা কোথায়; ও কিছুতেই বললো না।'

নির্বিকারভাবে কথাগুলো বললো, অলিন। তাকালো বিজ্ঞানীদের দিকে। বললো, 'আপনারা আপনাদের জীৱ সঙ্গে দেখা করতে চান?—সোহানা রানার কনুই ধামছে ধরলো। সোহানার ভয়টা রানাও অনুভব করছে। নৃশংস 'অলিন' বললো ঘরের অপর প্রান্তের বন্ধ দরজা দেখিয়ে, 'ওরা ও ঘরেই আছে।'

রানা ও সোহানা দাঁড়িয়ে রইলো। বিজ্ঞানীরা ওয়ার-এর পিছু পিছু লাইন করে সেই দরজায় এগিয়ে গেল। দরজা খুলে গেল অপর প্রান্তের।

শূন্যে পেল রানা নারীকঠের কামা, চীংকার। কঠের উত্তেজনা অবিশ্বাস মূহুর্তের ভেতরে অস্ত্র পরিবেশ সৃষ্টি করলো। বিজ্ঞানীরা ভেতরে গেলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

রানা তাকালো অলিনের দিকে। বললে, 'জীদের আটকে রেখেছিলেন, ওদের পিস্তলের মুখে রেখে নেভীর লোকদের বন্দী

করেছেন। এখন নেভীর কাজ ফুরিয়েছে। এবার বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন আপনার রকেট তৈরী এবং সুপারভাইসের জন্তে। জীরা তাদের স্বামীদের আপনার পক্ষে কাজ করার জন্তে বোঝাবে, কি বলেন ?’

অত্নিন বিশ্বয়ের সঙ্গে তাকালো রানার দিকে। তার পরেই হাতের বেতটা কঁপে উঠলো, রানার বাঁ চোখের নিচে গালে এসে লাগলো একটা শব্দ তুলে। রানাকে কিছু বললো না। কিন্তু বললো নেভীর লোকদের উদ্দেশ্যে, ‘ডক্টর মাসুদ রান’ একজন সলিড ফুয়েল টেকনে’লজিস্ট। কিন্তু একটু বেশি স্মার্ট, বেশি কোঁতুহলী। তিনি আমাদের দু’জন লোককে হত্যা করেছেন। কুফুরের বিষাক্ত কামড় খেয়েও আমার কাছে গোপন করেছেন। পারে নকল ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আমাকে ফাঁকি দিয়েছেন। উনি ধরে ফেলেছিলেন, আমি ডক্টর পীয়ের অলিন নই। চালাক লোক! একজন বিজ্ঞানীর এসব গুণ থাকাটা আমার মতে বিপদের কারণ হতে পারে।’

অবাক হয়ে তাকালো কমোডোর জুলফিকার। তার পাশের চাইনিজ অফিসারটা বললো, ‘ডক্টর মাসুদের হাতটা ব্যাণ্ডেজ করা প্রয়োজন।’

‘আপনি ভাবছেন,’- চাইনিজের উদ্দেশ্যে ‘অলিন’ বললো, ‘ডক্টর মাসুদ আপনাদেরকে মুক্ত করবে?’- একটু হাসলো খুনেটা। বললো, ‘ঠিক আছে, ওর চিকিৎসা করুন সেবারতী।’

রানা তাকালো ‘অলিনের’ দিকে। বললো, ‘ধন্ববাদ, ডক্টর অলিন।’

‘ম্যাকাইভার।’-সে উত্তর দিল, ‘ও মাথা খারাপ বুড়োর অপছায়া। হবার ইচ্ছে আর আমার নেই।’-মোহানার দিকে তাকালো, ‘মিসেস মাসুদ, আপনার বিলম্ব প্রয়োজন। আমার লোক আপনাকে ঘর দেখিয়ে দিচ্ছে—যান। আপনাকে এ পোষাকে ভালো লাগলেও আপনার পোষাকগুলো আরো সুন্দর, আমার লোককে বললে ওগুলো এনে দেবে গেস্ট-হাউস থেকে। হ্যাঁ, আপনার জেরা স্টাইপ বিকিনিতে

সান বাধ করতে পারেন। প্রচুর রোদ এখানে।’

‘ন’, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে থাকবো। ও বড্ড অল্পস্ব।’—
সোহানা বললো।

‘মীর!’

নামটা উচ্চারণ করে অল্প দিকে তাকালো ম্যাকাইভার। পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো কোচিমা। হাতে অটোমেটিক পিস্তল। চোখ দু’টো সোহানার উপর স্থির। ম্যাকাইভারের হাত মেয়েটার স্নগ্ধ-পরা নিতম্ব চাপ দিলো। বললো, ‘ওড গাল’।’

রানা বললো, ‘যাও সোহানা।’

কোচিমার আসল নাম মীর। ওরা বেরিয়ে গেল।

ডাক্তারের ব্যাগটা এনে দিল একজন। লেফটেন্যান্ট সাদিকের বেঁধে দেওয়া ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেললো ডাক্তার। পরীক্ষার করলো জায়গাটা। ইনজেকশন দিলো দু’টো। বেঁধে দিল নতুন ব্যাণ্ডেজ। রানা তাকালো কমোডোরের দিকে। বললো, ‘হ্যালো, জুলফিকার?’—যেন এতকণে দেখলো।

‘হ্যালো, ডক্টর মাসুদ।’—তার কণ্ঠে বিষ্ময়টা রয়ে গেছে।

ব্যাণ্ডেজ হয়ে গেলো। ম্যাকাইভার এসে বসলো রানার সামনে। বললো, ‘আপনাকে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। আজ আপনাকে পিকিং ডাক দেখাবো। সব কমপ্লিট, শুধু ফিউজিং বাকী। ওটাই আপনার কাজ। আজই টেস্ট করার শিডিউল ডেট। আপনি ঠিক সময়েই এখানে পৌঁছেছেন! আপনার কাজ শুরু করুন।’

‘ওটা ডক্টর বরকত উল্লাহ কাজ।’—রানা বললো, ‘ডক্টর বরকত উল্লাহ কোথায়? ওকে আপনি এখনো হত্যা করেন নি আমি জানি।’

ম্যাকাইভারের চোখ ছোট হয়ে এল। বললো, ‘আপনি ফিউজ

লাগাবেন কিনা, বলুন।

‘আমি এখন ঘুমোতে চাই এবং এক বোতল ছইন্টি।’—রানা এবার সত্যি কথাই বললো, ‘আমি বড্ড ক্লান্ত। আর হ্যাঁ, ডক্টর বরকত উল্লাহকে না দেখা পর্যন্ত কাজে হাত দেবো না।’

ঘুমিয়ে উঠলো রানা দু’ঘণ্টা।

ঘুম ভাঙিয়েছে ডক্টর খান। জ্বর সঙ্গে দেখা করার পরে ওর সঙ্গে আর দেখা হয় নি রানার। চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। খুব বেশি ভেঙে পড়েছে বেচারা। রানা উঠে বসলো। জিজ্ঞেস করলো, ‘মিসেস খানের সঙ্গে দেখা হল?’

‘হয়েছে।’—করণ হয়ে গেল মুখশ্রী।

‘ম্যাকাভার আর কি কি জিজ্ঞেস করলো?’

‘হাজারোটা প্রশ্ন। বেশির ভাগ রকেট সম্পর্কে।’—ডক্টর খান অঙ্গ-মনক হয়ে গেল, ‘সবার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কথা বলেছে ম্যাকাইভার। সাবার জীকে আবার আটকে রেখেছে। রানা...’—একটু ভেঙে বললো, ‘তোমার কি মনে হয় ম্যাকাইভার রকেট, বিজ্ঞানী এবং তাদের জী সবাইকে নিয়ে যাবে?’

‘কোথায়?’—রানা জিজ্ঞেস করলো।

‘চায়না!’—ডক্টর খান বললো, ‘চায়না আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। চাইনিজ নেভীর লোক এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেছে!’

রানা উত্তর দিল না। দিতে পারলো না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে, ‘আমাদের এখন শুধু নিজেদের কথাই ভাবতে হবে। শুধু নিজেদের বেঁচে থাকার কথা। কে বিশ্বাসঘাতক, সে কথা ভাবার সময়

পরেও পারবে।’

‘কিন্তু তুমি কি পারবে ফিউজিং করতে?’

‘ডক্টর খান, আপনি জানেন, আমি পারবো না। কিন্তু আপাততঃ আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। ওরা যদি জানে, আমি সলিড ফুয়েল সম্পর্কে কিছুই জানি না, তাহলে নেভীর লোকদের মত ওদের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবো।’

‘নেভীর লোকদের ওরা মেরে ফেলবে?’

‘আমাদেরও মারবে, কাজ শেষ হয়ে গেলে।’

‘আমাদের শুধু সময় নষ্ট করতে হবে। একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে, সেটা কিছুটা হেড অফিস অনুমান করেছে। আমি এখানে এসেছি, এখান থেকে নেভীর জাহাজ সরিয়ে নেওয়ার সল্যেহটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কমোডোর সানিয়াং সিং যদি এদের লোক না হয়, আমার মনে হয়, টেস্ট করতে দেয়ী দেখলে ওরাও এসে পড়বে। তাছাড়া যে কোন মুহুর্তে আমাদের নেভীর জাহাজ নোঙর করবেই।’

‘নেভী কিছু করতে পারবে না।’—বললো ডক্টর খান, ‘এরা আমাদের এবং মহিলাদের উপর পিস্তল ধরে নেভীকে সরে যেতে বাধ্য করবে।’

দরজার তাল খোলার শব্দে দু’জন সোজা হয়ে বসলো। ঘরে প্রবেশ করলো ওয়াং। ওয়াং-এর হাতে মেশিন পিস্তল। ওর পিছন থেকে ম্যাকাইভার জিজ্ঞাস করলো, ‘কেমন বোধ করছেন, ডক্টর মাসুদ?’

ঘরে এলা ম্যাকাইভার। তার হাত রাখা কোচিমার কাঁধে। অন্য হাতে বেত।

‘আপনার কি চাই এখন?’

‘ও, আপনি সোজা কথা বলুন।’—ম্যাকাইভার হাতের বেতটা

বীকালো। বললো, ‘এ ধরনের মানুষ আমি পছন্দ করি। বলুন তবে, আপনি ফিউজিং করিতে রাজী কি না।’

‘আপনি বেশি কথা বলা পছন্দ করেন, মিষ্টার ম্যাকাইভার। আপনাকে বলেছি আগেই, আমি ডক্টর বরকত উল্লাহকে দেখতে চাই।’

‘আমুন, ডক্টর বরকত উল্লাহকেই আপনি দেখতে পাবেন।’ ম্যাকাইভার বললে, ‘কিছু লাভ হবে না কিছুই। উনি পাগল।’

৯

সকালের ঘরটাতে প্রবেশ করে রানা কারবাইন হাতে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডের টার্গেট অনুসরণ করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখলো জানালার কাছে বসে আছে একটা লোক। কাঁচা পাকা কয়েকদিনের গজানো দাড়ি, ময়লা পোষাক, চোখে বিস্রাস্ত চাউনি।

মেজর জেনারেলের ক্রমে দেখা সেই ফটোগ্রাফের সঙ্গে কোন মিল না পেলেও রানা বুঝলো, এই হচ্ছে ডঃ বরকত উল্লাহ। ওয়াং এবং ম্যাকাইভারকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রানা। চোখ তুলে তাকালো ডঃ বরকত উল্লাহ। চোখে কোনো ভাষা নেই, শুধু বিরজিতরা দৃষ্টি। রানা বললো, ‘আমার নাম মাহমুদ রানা, আপনার দেশের লোক।’

‘আমার দেশ থেকে এসেছেন?’—খুশী হয়ে উঠে দাঁড়ালো ডঃ

বরকত উল্লাহ। বললো, ‘আচ্ছা আপনার কি মনে হয়, শেখ মুজিবের পাৰ্টি’ পাওয়ারে যাবে? আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। এবার ভাবছি, পলিটিক্‌সে নামবো, শেখ সাহেবের পাৰ্টিতে যোগ দেবো। আমি একটা চিঠি লিখেছি শেখ সাহেবকে, কিন্তু পোস্ট করতে পারি নি। এ জায়গাটা বড় খারাপ, একটা পোস্ট-বক্সও নেই।...এই যে ডঃ অলিন, আপনি না বললেন, একজন বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, এর কথাই বলেছিলেন।’

ম্যাকাইভার হাসলো, বললো, ‘হ্যাঁ, ডঃ বরকত, এই আপনার বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছিলেন।’

‘এই ছোকরা!’—রানার দিকে বিরজির সঙ্গে তাকালো, বললো, ‘কিহে ছোকরা, তোমার সঙ্গে আমার কবে আবার পিরিত ছিল?’

রানা হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল উত্তর বরকত উল্লাহ দিকে।

হিঃ হিঃ করে আপন মনে হাসলো ডঃ বরকত। বললো, ‘দেখলেন তো, কি ভাবে ধরে ফেগলাম। আসলে ও এসেছে আমার থিওরিটা হাতিয়ে নিতে। হঁ হঁ, আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। এমন কি রেবেকাকেও না। ও আমাকে ফাঁকি দিয়েছে।’

‘রেবেকা?’—রানার তড়িৎ প্রশ্ন।

‘রেবেকা ওনার স্ত্রী।’—ম্যাকাইভার উত্তর দিল, ‘ম্যানিলাতে কিছুদিন আগে মারা গেছেন।’

রানা তাকালো ডঃ বরকত উল্লাহ দিকে। একটু ভেবে বাংলার বললো, ‘মারা গেছে, না ওরা আপনার স্ত্রীকে হত্যা করেছে?’

চমকে তাকালো ডঃ বরকত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। বললো অনেকটা আপন মনেই যেন, ‘ওরা রেবেকাকে হত্যা করেছে।’

‘ইংবেজীতে কথা বলবেন আপনারা।’—ম্যাকাইভার দু’পা এগিয়ে

এল, 'নইলে কথা বলতে পারবেন না।'

'এই লোকটা কে, কি জন্তে এসেছে?'—ম্যাকাইভারকে জিজ্ঞেস করলো ডঃ বরকত, 'ও আমাকে বাংলায় বলে কি না, আপনি আমার জীকে হত্যা করেছেন!'

'ও মিথ্যে কথা বলছে।'—ম্যাকাইভার বললো, 'এই লোকটা হচ্ছেন নতুন সলিড ফুয়েল এক্সপার্ট'।'

'ফুয়েল এক্সপার্ট'!—ডঃ বরকত নিম্নিখ করে তাকিয়ে থেকে বললো, 'কোথেকে ট্রেনিং নিয়েছেন?'

'এম. আই. টি.।'

'আমার বন্ধু প্রফেসর রকওয়েলকে চেনেন?'

'নিশ্চয়ই চিনি।'

'বোড়ার ডিম চেনেন!—রেগে বাংলায় বললো ডঃ বরকত।

'ডঃ মাসুদ!—ম্যাকাইভার বললো, 'আর কথা বলবেন না। ওকে ফুৎকিয়ে দিচ্ছেন আপনি। ওয়াং সামনে এসে রানাকে মেশিন পিস্তল দেখিয়ে সঁরে যেতে নির্দেশ দিল। ঘরের অস্ত্র পাশে আসতেই ম্যাকাইভার বললো, 'এবার চলুন, পিকিং ডাক দেখবেন।'

'দেখবো, কিন্তু তার আগে ডঃ বরকতের সঙ্গে এ বিষয়ে একা আলাপ করতে চাই।'

'পাগলের সঙ্গে আলাপ করে কোন লাভ হবে কি?'

'না, হবে না।'—রানা বললো, 'আপনার মনে রাখা উচিত, এটা পরীক্ষামূলক প্রকল্প। এর পরিকল্পনার ডঃ বরকতের দানই প্রধান। পাগল হলেও তাঁর কাছ থেকে কিছু কথা বের করতে পারি।'

'না, এতে আমরা রাজী নই।'

'তবে পিকিং ডাক দেখার সময় ওঁকে আমার সঙ্গে থাকতে দিন। পাগল হলেও ক্ষতিকর পাগল উনি নন। পিকিং ডাক দেখলে হয়তো

তার বিস্ময় দূর হতে পারে।’—রানা বললে, ‘উনি ভাল হলে আপনারই লাভ, মিঃ ম্যাকাইভার।’

ম্যাকাইভার একটু ভেবে ওয়াংকে নির্দেশ দিল। ওয়াং গিয়ে ডঃ বরকতকে বললে, ‘পিকিং ডাক দেখবেন।’

রানা দেখলো, ডঃ বরকত কোন কথা না বলে উঠে এল সিগারেট টানতে টানতে।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ডঃ বরকত। রানা দেখলো, উপরে লেখা—‘নো স্মোকিং।’

হাঙ্গারের অটোমেটিক দরজা খুলে গেল চাবি ঘুরিয়ে সুইস টপতেই।

পিকিং ডাক!

রানা দেখলো, চকচকে ইস্পাতের আবরণ, পেলিলের মতো সিলিণ্ডার দোতালার সমান উঁচু হলে উপরের বাতাস আসার জন্যে উঁচু করে দেওয়া ছাদ স্পর্শ করেছে প্রায়। দোতালার মত উঁচু, ব্যাস চার ফুটের মত। ইস্পাতের তৈরী বগির উপরে সাজানো রয়েছে দু’টো একই আকারের বকেট—পিকিং ডাক। নিচ থেকে উপর পর্যন্ত ইস্পাতের ক্রেন হাতলের সাহায্যে খাড়া করে রেখেছে বকেট। ডঃ বরকত উল্লাহ বললে, ‘এটা আমার আবিষ্কার। বড় কঠিন জিনিস। ফাস্ট ক্লাস জিনিস বানাচ্ছিলাম, রেবেকা মার্ভার করে দিল সব হঠাৎ করে গিয়ে। ইচ্ছা ছিল এটা দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করবো। একটা জাহাজ নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবো রেবেকাকে নিয়ে—মার্ভার ভাইকিং সেজে।’

‘শেষ করলেন না কেন?’

‘করলাম না ওরা আমাকে করতে দেয় না বলে। ওদের দিয়ে দিইনি। অবশ্য আমি বলেছিলাম, একটা আমাকে দিয়ে দিতে,

ভেলা বানাতাম এটা দিয়ে। আচ্ছা, ডঃ মাসুদ, একটা সিলিগার যদি খালি করা যায়, কতটুকু বাতাস ধরবে—কয় পাউণ্ড ?’

ইংরেজীতেই বলছিল ডঃ বরকত উল্লাহ কথাগুলো।

কথার উত্তর না দিয়ে রানা একটু এগিয়ে গেল, প্রথম রকেটটার সঙ্গে ফ্রেন-হাতলের সঙ্গে লাগানো খোলা লিফটে উঠে পড়লো। পাশে উঠে দাঁড়ালো ম্যাকাইভার। স্নাইচ টপে দিল। পাঁচ ফিট উঁচুতে উঠে এল লিফট। পকেট থেকে চাবি বের করলো ম্যাকাইভার। রকেটের গারের ছোট একটা চাবি-ছিদ্রে ঢুকিয়ে দিয়ে, হাতল ধরে চাপ দিল। সাত ফিট দরজাটা খুলিয়ে গেল। ভেতরে আরেকটা আবরণ। দু’আবরণের মধ্যবর্তী ফাঁক পাঁচ ইঞ্চি।

ভেতরের আবরণের গায়ে দেখতে পেল অনেকগুলো তার, বক্স, স্নাইচ ইত্যাদি। দেখলো লেখা রয়েছে : Propellent, on off safe-armed—একম চেনা শব্দ। ম্যাকাইভার বললে, ‘বুঝলে কিছু ?’

রানা মাথা নাড়ালো, দেখে যেতে লাগলো, চেষ্টা করলো মনে রাখতে। Propellent বক্স থেকে দু’টো প্লাস্টিক আবরিত তার বের হয়েছে। একটা দেড় ইঞ্চি মোটা, অল্পটা আধ ইঞ্চি। তার দু’টো নিচে ভেতরের দিকে চলে গেছে সাতটা বিভিন্ন-মুখি ভাগ হয়ে। আধ ইঞ্চি মোটা একটা তার দু’টো বক্সকে যোগ করেছে এবং দুই ইঞ্চি মোটা একটা তার Propellent-এর সঙ্গে বাইরের এবং ভেতরের আবরণের মাঝখানে বসানো তৃতীয় একটা বক্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

‘এবার উপরে যেতে পারি ?’—জিজ্ঞাস করলো ম্যাকাইভার। রানা মাথা নাড়লো। তাকিয়ে দেখলো, ডঃ বরকত এদিকে তাকিয়ে হাসছে দাঁত বের করে, নিচে দাঁড়িয়ে। ওয়াং তাকে খুব কাছ থেকে চোখে চোখে রেখেছে। দরজা বন্ধ করে স্নাইচ টপলো ম্যাকাইভার, লিফট আরো ছয় ফিট উপরে উঠে এল। আর একটা দরজা খুললো,

এটা অনেক ছোট আগের দরজাটার চেয়ে ।

এবার দেখলো, ভেতরের আবরণে একটা গোলাকার জানালা । ভেতরে আরো দেখা গেল, পনেরো-বিশটা গোলাকার পাইপ মাঝারি দিকে ক্রমে সঙ্কু হয়ে গেছে । পাইপগুলো বেটন করে আছে সিলিঙারের মত একটা জিনিসকে । সিলিঙারের মাথা থেকে ইকি ছয়েক ডায়ামিটারের কিছু একটা প্রবেশ করেছে পাইপের ভিতরে । বাইরের আবরণে তার দেখতে পেল একটা, তারের মাথায় সলিড কপারের গ্রাগ । গ্রাগটা খোলা । তারটা 'আর্মড' লেখা বক্সের তারের অনুরূপ । দেখে বোকা যায়, এ গ্রাগ কোথাও লাগানো হবে ।

এরপর লিফ্ট নামলো একেবারে নিচে । এবার রানা দেখলো উপরের পাইপগুলোর গোড়া । উপরের Propellent বক্স থেকে বের হয়ে আসা সাতটা তারও দেখলো । ওগুলো এখানে পাইপের সঙ্গে মাথা-প্রশাখা বিস্তার করে পুরো ব্যাপারটাকে প্যাঁচালো করে ফেলেছে । রানার মাথাটা প্রায় ঘুরে যাবার জোগাড় হল ।

'হয়েছে ?'—জিঙ্কস করলো ম্যাকাইভার ।

রানা উত্তর দিল, 'হয়েছে ।'

'এই যে ডঃ মাসুদ ।'—ডঃ বরকত বললো, 'আপনি কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দেন নি । আসার সময় মুলিগঞ্জের কলা এনেছেন ?'

রানা পাগলের কথায় কান না দিয়ে বললো, 'এর প্রিন্টটা কোথায় ?'

'ডঃ বরকতের কাছ থেকে তার নোট বইগুলো রক্ষা করতে পেরেছি, কিন্তু প্রিন্ট খুঁজে পাই নি । তবে রকেটের মডেল আছে এবং বিজ্ঞানীরাও রয়েছেন আমার হাতে ।'—বিরাত হৃগির সঙ্গে কথামতো বললো ম্যাকাইভার ।

রানা বললো, 'এখন আমি ডঃ বরকতের সঙ্গে একটা আলাপ করতে চাই । উনি হয়তো বলতে পারবেন, কোথায় রেখেছেন রু প্রিন্টটা ।'

‘বললে আগেই বলতেন।’

‘তবে তার নোট নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারি কি?’

চিন্তিত মনে হল ম্যাকাইভারকে। বললো, ‘কোনো লাভ হবে? তাঁর চিন্তায় এখন কোনো সামঞ্জস্য নেই।’

‘না থাকলেও আমি তাঁর নোট দেখে প্রসন্ন করে স্ত্রী বের করে নেবার চেষ্টা করতে চাই।’

ডান হাতে ছড়িটা ধরে ম্যাকাইভার বাঁ হাতের তালুতে ঠুকলো। বললো, ‘কোন ট্রিক্স করবেন না তো?’

‘না।’—পয়সিকার জবাব দিল রানা।

‘আমি আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই প্রথম টেস্ট-রকেট তৈরী চাই।’

—ম্যাকাইভার বললো, ‘আপনি দশ মিনিট ডঃ বরকতের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।’

দশ নয়, রানা পনেরো মিনিট কথা বললো ডঃ বরকতের সঙ্গে। রানার প্রথম প্রশ্ন ছিল, ‘ডঃ বরকত, আপনি আসলে স্ত্রী—এদের সামনে অভিনয় করছেন কেন?’

‘আপনি কে?’—রানার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করলো ডঃ বরকত, ‘কেন আমাকে ডিসটার্ব করছেন? তাছাড়া, আপনি এদের সামনে ফুয়েল এক্সপার্টের অভিনয় করছেন কেন? আপনি ফুয়েল সম্পর্কে কিছুই জানেন না।’

‘না, জানি না।’

‘তবে এদের সাহায্য করতে চান কেন, আর করবেনই বা কিভাবে?’

—ডঃ বরকত বললেন, ‘কেন আমাকে এদের সঙ্গে কাজ করার জন্তে পারমিত্ত্য করতে এসেছেন?’

‘আমি কিছুই করবো না। শুধু সত্য ঘটনাটা জানতে চাই।’

‘ওরা যদি জেনে ফেলে, আপনি নকল লোক?’

‘ওরা আমাকে হত্যা করবে।’

‘তাহলে আমাকেও ঘাঁটাবেন না, নিজেও এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করুন।’—ডঃ বরকত বললো, ‘আমাকে ছাড়া ওরা এ রকেট নিতে পারবে না। কিন্তু আমি জীবন থাকতে তা করবো না। আমার স্ত্রীকে ম্যাকাইভার খুন করেছে, তবু আমাকে দলে নিতে পারে নি। আমার আর কিছুই নেই পৃথিবীতে যা আমি হারাতে পারি। পৃথিবীর কেউ আমাকে রাজী করাতে পারবে না। আপনিও না।’

‘আমিও তা চাই না।’

‘কেন তবে এখানে এসেছেন?’

‘আপনাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে।’

‘এখান থেকে কোন উদ্ধারের পথ নেই। এখানে বারো আঁছে সবাইকে ওরা মেরে ফেলবে। আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমি মনে করি, আমাদের সবাইকে মেরে ফেলেও ওরা যদি রকেট না নিতে পারে সেটা অনেক ভাল।’

‘এরা রকেট কোথায় নিয়ে যাবে?’—রানা জিজ্ঞেস করলো, ‘কে এই ম্যাকাইভার?’

‘ম্যাকাইভার ছিল সি. আই. এ. এজেন্ট। ওর সাথে কমিউনিস্ট চীনের ভেতরেও কেউ কাজ করছে বলে আমার ধারণা। চীনের নেতীর কর্তা গোহের কেউ এবং এই ম্যাকাইভার পুরো পরিকল্পনা করছে। আমার বন্ধু ডঃ অলিনকে হত্যা করে তার জগৎসজ্জা নিয়ে আমার চোখে ধরা পড়ে যায় ও। আমি তার আগে থেকেই গোপন স্বপ্নের কথা অনুমান করেছিলাম। অনুমান করেছিলাম, চাইনিজদের মধ্যে কেউ কেউ সন্দেহজনক। কথাটা ডঃ খানকে বলি। কেউ

কথাটার গুরুত্ব দেয় নি। এরপর যখন আমি ডঃ অলিনের বাড়ি যাই সেখানে আমার স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে অবাক হই। ম্যাকাইভার আমার সামনে আমার স্ত্রীকে হত্যা করে, এবং আমাকে গুহার মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। আমি তখন থেকে বন্ধ পাগলের ভূমিকায় অভিনয় করতে থাকি।’

‘এরা রকেট নেবে কোথায়?’

‘এদের কথা থেকে যতটুকু বুঝছি, রকেট নিয়ে যাবে একটা অস্ত্র কারখানায়। ওখানে প্রস্তুত হবে এর হাজারোটা প্রোটোটাই।’
—ডঃ বরকত বললো, ‘আপনি আমাকে নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।’

‘আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করছি শুধু সময় নষ্ট করার জন্তে।’
—রানা বললো, ‘আপনার কাছ থেকে আপনি যা করছেন তার চেয়ে বেশি সাহায্য আশা করি না। আমি হলেও আপনার মতই কিছু করতাম।’

‘না, পারতেন না।’—ডঃ বরকত বললো, ‘আপনি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যেতেন। আমার চোখের সামনে ওরাং রেবেকাকে রেপ্ট করেছে, টর্চার করে মেরেছে ম্যাকাইভারের নিদেশে। আমি ঘুমুতে পারি না, আমি হয়তো কোনো দিনই ঘুমুতে পারবো না।—ঘুমুতে দুঃস্বপ্ন দেখি।’

‘আমিও দুঃখিত।’—রানা বললো, ‘আপনি আমার সঙ্গে কন্ট্রোল-ক্রমে চলুন। আমি ওদের দেখাতে চাই, ওদের জন্যে আমি কিছু একটা করছি।’

কিছু বললো না ডঃ বরকত। দরজা খুলে গেল, ঘরে মধ্যে এসে দাঁড়ালো ম্যাকাইভার। ও কিছু বলার আগেই রানা বললো, ‘কন্ট্রোল-ক্রমে যেতে চাই আমি।’

‘কেন?’

‘রেডিও কন্ট্রোল সিস্টেমটা দেখতে হবে।’

‘ফিউজিং এর আগে ওটা দেখার কি প্রয়োজন?’

রানা হাসলো, ‘আপনি আমার চেয়ে যখন বেশি বোঝেন তখন আমাকে আর দরকার কি?’

হাঃ হাঃ করে হাসলো ডঃ বরকত। বললো, ‘আপনিও আসলে কিছু করতে পারবেন না।’

‘আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, কথা দিয়েছেন, ডঃ বরকত।’

—রানা বললো, ‘আপনি আমাকে সাহায্য না করলে আমরা সবাই মারা পড়বো।’

‘পৃথিবীতে কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না, ডঃ মাসুদ। রেবেকা বাঁচে নি। পৃথিবীতে কেউ বাঁচবে না।’—ডঃ বরকতের একটু আগের শাস্ত সমাহিত চেহারা আবার বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে।

কন্ট্রোল-রুম মাটির তলে বসানো। তিন ফুট মাথা বের হয়ে আছে। তার উপর কয়েকটা বিভিন্ন আকারের এ্যাণ্টেনা, তিনটা র‍্যাডার স্ক্যানার ও চারমুখি চারটা পেরিস্কোপ বসানো। পিছনের দিকে কয়েক ধাপ নেমে ইস্পাতের তৈরী দরজা দেখে অনুমান করলো, ধারে-কাছে একশো টনের এক্সপ্রোসিভ ব্লাস্ট করলেও এর কিছু হবে না। ডঃ বরকত রানার পাশেই ছিল। তার চোখে-মুখে একটা নিরাসক্তি। রানা স্মৃদ্য খুপড়ি আর আলো দেখতে দেখতে এল কন্ট্রোল-বোর্ডের সামনে। এক-একটা নব মিনিটখানেক করে দেখতে লাগলো। Hydraulics—Auxiliary—Powder—Disconnect—Flight control clamps—Gantry-Ex—তারপরের বাটনটা হচ্ছে

Commit. এটা, সপ্তম বাটন ।

এটাতে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সংগ্রহ শুরু হবে, পাখা ঘুরবে, দু'সেকেন্ডে রকেটের উনিশটা সিলিণ্ডারের প্রথম চারটা সিলিণ্ডারের মুখ খুলে দেবে রিভলভিং ব্লক ড্রাম । দশ সেকেন্ড পর রানার পাশ থেকে হাত-পা নেড়ে বলতে লাগলো ডঃ বরকন্ত, 'তারপর শেষ বাটন আপনি ব্যবহার করতে পারেন, এইটখ্ অ্যাণ্ড লাস্ট বাটন ।'

লাস্ট বাটন ! রানা এবং ম্যাকাইভার দু'জনই দেখলো শেষ বাটনটা । এটা অন্য সাতটা বাটন থেকে বেশ দূরে । লাল চোকে উঁচু জাম্‌গার মাঝখানে সাদা বাটন । বাটনের উপর লেখা : E G A D S. রানা জানে, এর মানে—ইলেকট্রনিক্স গ্রাউণ্ড অটোমেটিক ডেসট্রাক্ট সিস্টেম । এটা কেউ ভুল করে চাপ দেবে না । এর একটা তারের তৈরী ঢাকনা আছে, এবং এটা চাপ দেবার আগে বোতামটাকে ১৮০° ঘুরিয়ে নিতে হবে ।

ম্যাকাইভার ডঃ বরকন্তের দিকে তাকালো । কিন্তু তার দৃষ্টি স্থির হতে পারলো না । ঘরের মধ্যে আরো একজন এসে দাঁড়িয়েছে । লোকটা ম্যাকাইভারের সঙ্গে দ্রুত কি যেন আলাপ করে চলে গেল ।

ম্যাকাইভার ফিরে তাকালো রানার দিকে । বললো, 'ডঃ মাস্তদ, তাড়াতাড়ি করুন । সানইন্সার্জ ক্রুজার থেকে এইমাত্র রিপোর্ট' করা হয়েছে, যে, আবহাওয়া খারাপ । আরো খারাপ হলে পরীক্ষা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে ।'

'আবহাওয়াও আপনার বিজ্ঞে ?'

'ও সব বাজ্ঞে কথার সময় এটা নয় ।'—ম্যাকাইভার দ্রুত বললো, 'ফিউজ ঠিক করতে কতক্ষণ লাগবে ?'

'আমি ঠিক বলতে পারবো না ।'

‘কেন ?’

‘ওটা কি ভাবে আছে. দেখতে হবে, তারপর আপনাকে সমস্ত দিতে পারি।’

‘তবে কাজ এখনই শুরু করুন।’

‘কি কাজ !’—রানা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

‘ফিউজিং স্ত সার্কিট।’

‘ওটা যদি আমি করি তবে আমি কেন, আপনিও বাঁচতে পারবেন না। এখানকার একটা প্রাণীও বাঁচবে না।’

‘কেন ?’

‘আমি ফুরেল টেকনোলোজির কাঁচকলাও জানি না।’—নির্বিকার ভাবে বললো রানা। ‘বিবেস না হয় জিভেস করুন ডঃ বরকতকে।’

‘ডঃ বরকতের কথা শুনতে চাই না। আমি জানতে চাই, আপনি ফিউজিং করবেন কি না।’

‘না, সেরকম কোন ইচ্ছে নেই আমার।’

‘তবে এতক্ষণ কিসের বাহানা করছিলেন ?’

‘আমি সমস্ত নষ্ট করতে চাই। এখানে যে কোন মুহুর্তে নেভীর ফোর্স এসে পড়বে।’

ম্যাকাইডার শুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার পরই দূলে উঠলো তার হাতের বেতটা। সপাং করে এসে পড়লো রানার মুখে। দ্বিতীয়বার গলার কাছে। আবার উঠলো...রানা হাত তুললো বেতটা ধরার জন্যে। কিন্তু বাঁ হাতের ব্যাণ্ডেজসহ হাত দুটো চেপে ধরলো ওয়াং। বেত ফেলে দিল ম্যাকাইডার। বিশাল হুটি এবার বেৎলে দিল রানার ব্রজাজ নাক-মুখ, দ্বিতীয় রো এসে পড়লো চোয়ালে...

‘স্টপ !’

থেমে গেল ওয়াং। ডঃ বরকতের কণ্ঠ। কণ্ঠের পরিষ্কার দৃঢ়তা

ধামতে দিল ওদের। ওয়াং ছেড়ে দিল রানাকে। খুঁকে পড়লো রানা। মাথা সোজা রাখতে পারছে না। হাঁটুর উপর বসে পড়লো মাটিতে।

ডঃ বরকত বললো, 'ওকে মেরে ফেললে আপনি কোনদিন রকেট নিয়ে যেতে পারবেন ?'

'ডঃ বরকত !'—বিস্মিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো ম্যাকাইভার।

'হ্যাঁ, আমি পাগল হই নি। অভিনয় করছিলাম আপনার অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্তে।'—ডঃ বরকত বললো, 'আমি যদি ফিউজিং করি ?'

'আপনি !'—ম্যাকাইভার ডঃ বরকতের চোখের দিকে চেয়ে দেখলো। পুরো ত্রিশ সেকেন্ড। বললো, 'ন', আপনি কোনো চাল চালবেন। আপনার কোনো ভয় নেই, কারণ কেউ আপনার নেই এখানে। রকেটে এক্সপ্রোশন ঘটলে আপনার কিছু আসে যাবে না।'

'না, ওকে বিশ্বাস করবেন না মিস্টার ম্যাকাইভার, ওর মাথা ঠিক নেই। ওর মনে এখনও প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে।'—রানা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'কেউ আপনার রকেট ফিউজিং করবে না।'

'আপনিই করবেন, করতে আপনি বাধ্য।'—ম্যাকাইভার বললো, 'এখনই পুরো নেভীকে দাঁড় করানো হবে লাইন দিয়ে। তারপর ওদের এক-একজনকে গুলি করা হবে তিন মিনিট অন্তর, যতক্ষণ আপনি রাজী না হবেন। আপনি জানেন, কমোডোর জলফিকারকে কিভাবে বশ করিয়েছি !'

'আমি জানি, তুমি একটা দানব।'—রানা বললো, 'মানুষের সাধারণ একটা বৃত্তিও তোমার মধ্যে নেই।'

'কিন্তু আপনার মধ্যে আছে। আপনি কি সহ্য করতে পারবেন, একজন নিরাপরাধ নেভী আপনার জন্তে মারা যাবে ? মারা যাবে

বিজ্ঞানীরা...।’

‘পুরো নেভী, সব বৈজ্ঞানীদের মেরে ফেল।’—রানা বললো, ‘কোন লাভ হবে না। আমি ফুরেলিং-এর কথ-ও জানি না।’ আমি বিজ্ঞানী নই, ম্যাকাইভার। তোমার মতই একজন হত্যাকারী। আমি কাউটার-এসপিওনেজ এজেন্ট। খুন করার স্বাধীনতা আমার আছে। আমার উপর অর্ডার, শুধু এই রকেটকে কেন্দ্র করে আসল চক্রান্তকে নষ্ট করা। এর জন্ত কত জীবন নষ্ট হল, আমি হিসেব করবো না। যাও ইচ্ছে মত হত্যা কর, খুন কর, রেপ কর—কিন্তু তুমিও পালাতে পারবে না এ দীপ থেকে!’

সুতক চোখে তাকিয়ে আছে ম্যাকাইভার রানার রক্তাক্ত মুখের দিকে। বাঁ চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে এসেছে রানার। ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত ঝরে ভিজিয়ে ফেলেছে শার্ট। রানা দেখলো, তার সামনে দাঁড়ানো কয়েকটা সুতক মূর্তি। ডঃ বরকত তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখে-মুখে বিদ্রোহ নেই, চিন্তা জুড়ে বসেছে, বিষয় কেঁপে যাচ্ছে।

‘ডঃ মাসুদ, যত শক্ত মানুষই হন না কেন, প্রত্যেক মানুষের এ্যাটিলির হিলের মত দুর্বল স্থান থাকেই।’—ম্যাকাইভার বললো, ‘আপনি আপনার স্রীকে ভালবাসেন?’

কোচিমার নিতম্ব হাত রাখলো ম্যাকাইভার। কোচিমা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

রানার চারদিক ঘুরে গেল। ঢোক গিললো। অনুভব করলো, মুখে একটুও পানি নেই। রানা রক্তে রক্তে পরাজয়কে অনুভব করছে এবার। জিভ চাটতে গিয়ে রক্তের নোনতা স্বাদ পেল। এবার ভয় পেয়েছে রানা, কিন্তু নিজেকে মুহূর্তে স্থির করে ফেললো। শরীরের সমস্ত ব্যথা দিয়ে ভুলতে চাইলো। সোহানার মুখ, সোহানার কণ্ঠস্বর, সোহানার গন্ধ, সোহানার স্পর্শ।

‘তুমি একটা আস্ত গদ’ভ !’—বাস নিয়ে ছড়ে যাওয়া ঠোঁটে হাসার চেষ্টা করলো রানা। বললো, ‘ও আমার জীই নয়, ওর নাম মোহানা চৌধুরী। ওর সাথে আমার আলাপ কয়েকদিনের মাত্র। এই এসাইন্মেন্টে অফিসিয়াল পার্টনার মাত্র !’

‘আপনার...জী নয় !’

‘না, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সহকর্মিনী। তাও এই প্রথম ওর সঙ্গে এক এসাইন্মেন্টে এসেছি।’

‘আপনার জী না হলে আপনার আর ভাবনার কিছু নেই।’—ম্যাকাইভার বললো, ‘তাকেও তবে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব, ভাবছি।’

‘কোথায় ?’

‘তাইওয়ান।’—ম্যাকাইভার বললো, ‘এখান থেকে যাবার ছ’ মাসের মধ্যে বিপুলভাবে আক্রমণ চালানো হবে উত্তর ভিয়েতনামের উপর। তারপর চায়না, তাপর...।’

থেকে গেল ম্যাকাইভার।

রানা জিজ্ঞেস করলো, ‘তারপর ?’

‘তারপর যা হবে সেটাই আমার স্বপ্ন !’—ম্যাকাইভার বললো, ‘যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে তাইওয়ানের বন্ধু না সেজে আমি নিজেই ক্ষমতা দখল করতে চাই। এশিয়ার একছত্র অধিপতি হতে চাই আমি। আপনি জানেন, একটা ছোট জাহাজ হলোই এ রকেট নিক্ষেপ কর-
বার। আমি প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ভরে দেবো সাব-
মেরিন আর জাহাজে—জালের মত ঘিরে রাখবো...।’

‘আপনার মাথাটা পরীক্ষা করানো দরকার।’—রানা বললো, ‘একেবারেই গেছে আপনার মাথা।’

‘এবার আপনার মাথা ধরাপ হবে !’—ম্যাকাইভার বললো, ‘দেখুন-
কে এসেছেন।’

রানা দেখলো, সোহানা। সোহানার পিছনে পিঙ্গল হাতে কোচিমা।
 --সোহানা এখনো সুস্থ আছে। দেখে মনে হয়, কাঁচা ঘুম থেকে
 উঠে এসেছে সারারাত ঘুমায় নি। সোহানা রানার দিকে চেয়ে
 চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। চীৎকার করতে গিয়েও সামলে নিল।
 ক্ষত পদক্ষেপে রানার কাছে আসতে গেলে ম্যাকাইভারের ছড়ি বাধা
 দিল, পথ রোধ করলো সোহানার।

‘আমি দুঃখিত, আপনাকে অসময়ে ঘুম থেকে ওঠাবার জন্তে,
 মিসেস মাসুদ...।’—বলে একটু হাসলো ম্যাকাইভার, বললো, ‘অথবা
 মিস চৌধুরী।’

সোহানা তাকালো ম্যাকাইভারের মুখের দিকে। উত্তর দিল না,
 দিতে পারলো না। রানার দিকে চেয়ে ওর ঠোঁট কাঁপলো কিছু বলার
 জন্তে। এবারো পারলো না কিছু বলতে।

‘দেখুন মিসেস মাসুদ, উনি আপনাকে অস্বীকার করেছেন।
 অস্বীকার করেছেন পিকিং ডাক ফিউজিং করতে...।’

‘রানা কোনো দিন করবেও না।’

‘করবেন, আপনি বললে নিশ্চয়ই করবেন।’

‘আমি কোনোদিন বলবো না।’

‘আপনি না বললেও আপনাকে দিয়ে মিস্টার মাসুদকে স্বীকার
 করাতে বাধ্য করবো।’

‘আপনি বাজে কথা বলছেন,’—সোহানা বললো, ‘আমরা পরস্পরকে
 ভাল করে চিনিই না। ওর কাছে আমি বিশেষ কিছু নই, ও ও
 আমার...।’

‘বিশেষ কিছু নয়—এইতো। বলতে চান?’—ম্যাকাইভার গার্ডদের
 কাছে এসে দাঁড়াতে বললো। গার্ডরা রানা ও ডঃ বরকতকে কভার
 করলো অটোমেরিকের মাথার। ওরাংকে ইশারা করলো। ওরাং

সোহানার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। দু'হাত পেছনে বাঁকিয়ে ধরলো। ককিয়ে উঠলো সোহানা। ওয়াং সামনের দিকে চাপ দিল—মাথা ঝুঁকে পড়লো, মাথা ভরা খোলা চুল সামনে এসে পড়লো। ম্যাকাইভার কাছে এগিয়ে গেল। সোহানার মস্তন কাঁধে হাত বুলিয়ে ঘাড়ের পিছনের একমুঠি চুল আলাদা করলো যত্নের সঙ্গে। তাকালো রানার দিকে। তারপর প্রচণ্ড চীৎকার শোনা গেল একটী। রানা দেখলো, ম্যাকাইভারের হাতে এক মুঠো চুল। চুলের গোড়ায় কাঁচা রক্ত। এক পা এড়লো রানা। কারবাইনের নল পেটে ঠেকলো। সোহানা গোঙাচ্ছে। রানার নাম ধরে ডাকছে। ডঃ বরকত উল্লাহ তাকিয়ে আছে রানার স্থির চোখের দিকে। ম্যাকাইভার আবার এগিয়ে গেল।

রানা চীৎকার করে উঠলো, ‘ওকে আবার স্পর্শ করলে তোমাকে খুন করে ফেলবো। খোদার কসম।’

‘আপনি রাজী?’

‘রাজী!’

‘ওড।’—ডঃ বরকত বললো, ‘এহাড়া আপনার আর কিছু করার ছিল না, মিস্টার মাসুদ। কিন্তু আপনি আমার সাহায্য ছাড়া ফিউজিং করতে পারবেন না।’

ম্যাকাইভার এগিয়ে এল। বললো, ‘ডঃ বরকত সাহায্য করবেন। তার উপর আমাদের বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমি জানি, ডঃ বরকত কোন চালাকী চালালে আপনি তা সংশোধন করে দেবেন, চালাকী করতে চেষ্টা করবেন। কারণ আপনি আপনার প্রেমিকাকে ভালবাসেন।’

রানা চোখ তুলে তাকালো। সোহানা মাথা তুলে তাকিয়ে আছে তার দিকে একদৃষ্টে। রানা ভাবলো : ভালবাসি। সোহানার এই বেঁচে থাকাকে ভালবাসি। ভালবাসি ওর এই নির্ভরশীলতা।

সোহানা এগিয়ে এল। এবার কেউ বাধা দিল না। রানার বুক মিশে গেল সোহানা। ও কাঁদছে, ভয়ে কাঁপছে। ভয় মেশানো কান্নায় অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কিভাবে ফিউজিং করবে তুমি? ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে!'

কোন উত্তর দিতে পারলো না রানা। ম্যাকাইভার ওদের দেখছে। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো ক্রুর হাসি। হাতটা চলে গেল কোচিমার নিতম্বে। খামচে ধরলো এবার। পোষা কুকুরের মত এলিয়ে পড়তে চাইলো কোচিমা। হাতটা তুলে একটা চাপড় দিল। রানার বুক থেকে টান মেরে সোহানাকে সরিয়ে নিল কোচিমা।

১০

ডঃ বরকতকে সাহায্য করছিল বাঙালী নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট ডঃ সেলিম খান, ব্রিটিশ হাইপারসনিক এক্সপার্ট ডঃ আওয়ারউড এবং কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা। ডঃ বরকতের ডান পাশে বসে প্রতিটি জিনিস লক্ষ্য রাখছিল রানা। ডঃ কাজ করে চলেছেন একভাবে। কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে, চোখ তার নিবন্ধ প্রতিটি তারে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কার্যকার্যে। দুই রকেটে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে বেজে হচ্ছিলো ম্যাকাইভারের আদেশে। একবার এটার কাজ করে অন্যটাতেও তাই করতে হচ্ছিলো। ডঃ সেলিম, ডঃ আওয়ারউড এবং রানাকে

নিষেধ করলো ম্যাকাইভার পরস্পরের মধ্যে কথা বলতে। দুই রকেটের কাজ একই রকম হচ্ছে কিনা মিলিয়ে দেখছিল সবাই। তাদের জীনের কথা শ্রবণ করতে বলা হচ্ছিল বারবার। আগে একটি রকেট পরীক্ষা করা হবে। সেটা ঠিকভাবে নিক্ষেপ করা হলে দ্বিতীয়টা নিজে বাবে ম্যাকাইভার।

সবার চোখ নিবন্ধ ডঃ বরকত উল্লাহ হাতে। ওয়াং-এর অটোমেটিক টার্গেট করেছে রানার মাথা।

ডঃ বরকত উচ্চারণ করলো, 'ডেসট্রাক্ট-বল্লের চাবি?'

রানা বললো ওয়াংকে, 'ডেসট্রাক্ট বল্লের চাবি কোথায়?'

'আর কত দেবী?'

রানা উত্তর দিল, 'দুই মিনিট। ডেসট্রাক্ট-বল্লের চাবিটা প্রয়োজন।'

ডঃ খান এবং আগারউডকে নেমে আসতে হুকুম করলো ম্যাকাইভার। ওরা নামলে নিজে উঠে এল উপরে। বললো, 'শেষ মিনিটে কোনো চাল দেখাতে চান?'

রানা ক্রিপ্ত কণ্ঠে বললো, 'তবে আপনি নিজেই স্নইচটা দেখুন, ও স্নইচ চাবি ছাড়া নড়বে না।'

স্নইচে হাত দিল ম্যাকাইভার। নড়াতে পারলো না। চিন্তিত মুখে, বিধাষিত হাতে চাবিটা এগিয়ে দিল। ডঃ বরকত কোন কথা না বলে স্নইচটা খুললো! চারটে তারের প্যাঁচও খুললো। এবং কাজ শুরু করলো! পাঁচ মিনিটে স্নইচ বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল।

'শেষ?—ম্যাকাইভারের উৎসাহী প্রশ্ন।

এক পাশে রাখা একটা ঘড়ি হাতে নিয়ে রানা বললো, 'এটা শেষ হয়েছে, ওই রকেটে এটা সেটা করতে হবে।'

'ওটা পুরে করলেও চলবে। আমরা এটাকে আগে পরীক্ষা করতে চাই। সানইয়াং পরীক্ষা করার জন্তে সিগন্যাল দিচ্ছে। সময় কম

হাতে ।’—ম্যাকাইভার বললো। ওয়াং সবাইকে অটোমেটিকের মাথায় ধাঁড় করালো।

ম্যাকাইভার একজন গার্ডের উদ্দেশ্যে বললো, ‘ওয়্যারলেস অপারেটরকে খবর দাও, কুড়ি মিনিটের মধ্যে পিকিং ডাক আকাশে উঠবে।’

‘এবার আমরা কোথায় যাবো, কণ্ট্রোল-রুম?’—জিঞ্জেলস করলো জ্ঞানা।

‘কেন?’—উটে। প্রশ্ন করলো ম্যাকাইভার, ‘আশ্রয়ের জগৎ?—না, আমি অত বোকা নই, ডঃ মাসুদ। বিজ্ঞানী, টেকনিশিয়ান এবং নেনডীর লোকেরা বাইরে থাকবে যখন রকেট আকাশে উঠবে। আর আমরা সবাই থাকবো কণ্ট্রোল-রুমে।’

বিজ্ঞানীদের কয়েকটি কঠ প্রতিবাদ করলো। ডঃ আওয়ারউড বললো, ‘না, পরীক্ষামূলক রকেটের প্রথম নিক্ষেপের সময় অনেক এ্যাকসিডেন্ট ঘটতে পারে। এভাবে এতগুলো মানুষকে হত্যা আপনি করতে পারেন না।’

‘মার্ডারার!’—টিবিয়ে বললো জার্মান বিজ্ঞানী।

সবাই ডঃ বরকত উল্লার দিকে তাকাচ্ছে, ডঃ কিছু বলে কিনা। ডক্টর আপন মনে একটা সিগারেট হাতে নিচ্ছে। ওদের কারো কথা কানে গিয়েছে কিনা, বোঝা গেল না। বললো, ‘আমি বাইরে যেতে চাই। সিগারেট খাধো।’

ম্যাকাইভারও ডঃ বরকতের মুখের দিকে চেয়ে কিছু উদ্ধার করতে না পেরে রানাকে বললো, ‘ডঃ মাসুদ, আপনি এখনো বলুন, ফিউজিং-এ কোনো চালাকী নেই তো?’

‘ওটা আমি বলতে পারবো না নিশ্চিত করে।’—রানা বললো, ‘আজই এটার প্রথম নিক্ষেপ। সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপর নির্ভর করবে এর সাকসেস।’

‘হ্যাঁ, বেঁচে থাকাটাও আপনাদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করছে।’

‘আপনার গার্ডরা কিন্তু ভাগ্যের উপর নির্ভর করবে না।’

‘কোনো গার্ড বাইরে থাকবে না। তারাও কন্ট্রোল-রুমে আশ্রয় নেবে।’

‘তবে আমরাও নিশ্চয়ই লক্ষী ছেলের মত দাঁড়িয়ে থাকবো না। ক্যাসারাক্সা সঙ্গে।’

‘না, আপনারা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য। যিনি নড়বেন তাঁর জীকে কন্ট্রোল-রুমে হত্যা করা হবে। সাতজনই জী আমাদের সঙ্গে থাকছেন।’

‘সাতজন কেন। সোহানা কোথায়?’—রানার কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

‘মিস্ চৌধুরী...ওনাকে আর্মারীতে রাখা হয়েছে।’

রানা প্রশ্ন করলো না, কেন রাখা হয়েছে ওখানে। হয়তো সোহানা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রানা বললো ন’, তাকেও কন্ট্রোল-রুমে রাখা হোক। যদি পিকিং ডাক এক্সপ্লোড করে তবে আর্মারীও উড়ে যাবে। তাও ভালো কন্ট্রোল-রুমে বেঁচে থাকার চেয়ে।

‘ডঃ মাসুদ,’—ম্যাকাইভার বললো, ‘শেষবারের মত ভেবে দেখুন, যদি কোন ভুল থেকে থাকে, শূন্য করে দিয়ে আসতে পারেন।’

রানা ডঃ বরকতের নিরাসক্ত মুখের দিকে তাকালো। মাথা নাড়লো, বললো, ‘ন’, কোন ভুল নেই বলেই আমি জানি।’

ম্যাকাইভার বৈজ্ঞানিকদের দেখিয়ে বললো, ‘আপনি আবারও ভেবে দেখুন ডঃ মাসুদ, এতগুলো বিজ্ঞানী, এশিয়া-ইউরোপের এত-গুলো প্রতিভা, আপনার সামান্য ভুলের জন্তে মারা যাবেন!’

‘এখন মারা না গেলেও আপনি সবাইকে হত্যা করবেনই!’—বললো ডঃ খান, ‘আমরা মরতে চাই না। তাছাড়া আপনি রকেট নিরাপদে নিয়ে যান তাও চাই না। তার চেয়ে যত্নকেই আমরা প্রেফার করবো।’

‘এ প্রজেক্টে আপনারও স্বার্থ আছে, আপনি বন্ধ হয়ে গেছেন, কিন্তু সবাই আপনার মত মরতে চান বলে আমি বিশ্বাস করি না।’ —ম্যাকাইভার নাটকীয় ভঙ্গীতে বললো, ‘এখনো ভেবে দেখুন, আপনারা সবাই মরতে চান কিনা।’

‘রকেট কোন অস্ববিধার সৃষ্টি করবে না।’—এতক্ষণে ডঃ বরকত বললো বিরক্তির সঙ্গে।

‘আমিও তাই মনে করি।’—রানা আবার সমর্থন করলো কথাটা।

দেখা গেল, পিকিং ডাক বের হয়ে আসছে হ্যাঙ্গার থেকে। রেল-লাইনের উপর দিয়ে একটা বগি এগুচ্ছে মন্থর গতিতে। রোদে চক্‌চক্ করে উঠলো পিকিং ডাকের তরী শরীরটা।

রানা এবং বিজ্ঞানীরা এক পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের পিছনে টেক্‌নিশিয়ান ও নেভীর সবাই। কংক্রিটে বাঁধানো লাউজিং প্যাডের মাঝখানে বগি এসে দাঁড়ালো। দু’জন টেক্‌নিশিয়ান নেমে এলো বগি থেকে লাফ দিয়ে। কানেকটিং-বার সরিয়ে ফেললো। গার্ডের অটোমেটিক কারবাইনের ইশারায় টেক্‌নিশিয়ান দু’জন এসে পাশে দাঁড়ালো রানাদের। রকেটের আর লোকের দরকার নেই। এখন সবকিছু কন্ট্রোল করবে রেডিও। গার্ড’রা দৌড়ে চলে গেল কন্ট্রোল-রুমের উদ্দেশ্যে।

ডঃ এ্যাণ্ডারসন হঠাৎ ডঃ বরকতকে জিজ্ঞেস করলো, ‘ডক্টর বরকত, আপনি কি শিওর?’

‘শিওর?’—ডঃ বরকত হাসলো, ‘উঠবে, না ব্লাস্ট করবে?’

‘না, আমি বলছিলাম আমরা অকারণে প্রাণ হেঁবে কেন?’

‘এখন নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে লাভ আছে আর?’

সবার দৃষ্টিই কখনো ডঃ বরকত আবার কখনো রকেটের উপর

স্থির হতে গিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছিলো। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো রানা, 'এটা টার্গেট করা হয়েছে কোথায়?'

'প্রশান্ত মহাসাগরের একটা ভেলায়।'—পাশ থেকে বললো ইলেকট্রনিক্স বিশেষজ্ঞ জার্মানীর ডঃ ম্যাগ্নওয়েল, 'আমরা এখানে ইনফ্রারেড গাইডেন্স সিস্টেম ব্যবহার করেছি।'—বিশালদেহী ম্যাগ্নওয়েল কথা বলতে পেয়ে যেন রক্ষা পেয়েছে, 'এই ইনফ্রারেডের কাজ হচ্ছে, হিট ডিটেকশন। প্রশান্ত মহাসাগরের এক জাহাজগায় ম্যাগনেটিজমের ভেলায় এটা টার্গেট করা হয়েছে। ভেলাটা মাত্র ছয় ফিট চওড়া, খাটফিট লম্বা। রকেট যখন অ্যাটমোস্ফিয়ারে পুনঃপ্রবেশ করছে তখন স্টেলার নেভিগেশনের সুইচ অফ করে দেওয়া হবে। তখনই ইনফ্রারেড কাজ শুরু করবে। আমাদের জাহাজ সানইন্সট্যান্স থেকে ম্যাগনেটিজম ভেলায় রেডিওর সাহায্যে তাপ স্রষ্টা করবে ঠিক নব্বই সেকেন্ড আগে। ঠিক নব্বই সেকেন্ড, দেড় মিনিট আগে যদি তা না করে, তবে সানইন্সট্যান্সের চুম্বীতে পড়বে রকেট—ইনফ্রারেড অপেক্ষাকৃত উত্তাপে আকর্ষিত হয়।'।

'যদি তারা ভুল করে?'

'তারা তা করবে না। এখান থেকে রকেট ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও সিগন্যাল চলে যাবে।'।

'ধরুন, যদি সানইন্সট্যান্সের কারো কোনো গাফিলতি ঘটে...?'

রানার কথার উত্তর দিল না কেউ। পিকিং ডাক রেডিও মারফত কাজ শুরু করেছে। কেনের উপরের ক্র্যাম্প খুলে গেল...উপরের হাইল বুরতে লাগলো।...নাইন...এইট...সেভেন...সিক্স...ফাইভ...ফোর...থ্রি...টু...ওয়ান।

অরুণ রঙের আঙনের ঘেঁপে ওঠা বল পিকিং ডাকের নিচ থেকে বের হয়ে এল। বজ্রপাতের শব্দ চারদিক কাঁপিয়ে দিল।...আন্তে

আশ্বে উঠে যাচ্ছে পিকিং ডাক। শব্দটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পাহাড়ে পাহাড়ে। বাতাস বইছে প্রচণ্ড বেগে। ধীরে ধীরে উপরে উঠছে পিকিং ডাক। এটাই পিকিং ডাকের বৈশিষ্ট্য। এর জন্তই যে কোন বেজ থেকে এটা নিক্ষেপ করা যাবে।...পরপর তিনবার এরপ্রোশনের শব্দ হল। ততক্ষণে পিকিং ডাক দুংশো ফিটে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ মুহূর্তে গতিপ্রাপ্ত হল—অসম্ভব গতি। আট সেকেন্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল রকেট।...পিকিং ডাকের অস্তিত্ব নেই আর। শুধু একটা ফুয়েল পোড়া এসিডের মত গন্ধ এবং কালো বগিটা তার স্মৃতি বহন করছে। ডঃ বরকত শুদ্ধ হয়ে শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই তার দিকে চাইতেই দেখলো, একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে। তার ঠোঁটের কোণে। তাকিয়ে আছে অদৃশ্য হওয়া রকেটের পথ অনুসরণ করে।

এগিয়ে গেল ডঃ ম্যাকগুয়েল। ডঃ বরকত ফিসফিস করে বললো, ‘আমাদের কষ্ট ব্যথা যায় নি। আমি জানতাম, আমরা সাকসেস্-ফুল হবোই।’

‘কিন্তু এভাবে নয়।’—ডঃ সেলিম খানের কণ্ঠে স্পষ্ট অসন্তোষ।

করণ হয়ে গেল ডঃ বরকতে মুখ। বললো, ‘যে ভাবেই হোক, আফটার অল ইটস্ আওয়ার সাকসেস্।’—দাঁড়ালো না ডঃ বরকত। হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের দিকে এগিলো।

রানা অনুভব করলো ডঃ বরকত উল্লার ব্যথা, কষ্ট এবং খুশিকে। রানার মায়া হল।

‘ডঃ বরকত শেষ পর্যন্ত সহযোগিতা করলেন।’—রানার পিছনে কমোডোর জুলফিকারের কঠোর ক্লক কণ্ঠস্বর। রানা ফিরে দাঁড়ালো।

‘কেন. আপনি কি সুইসাইড করতে রাজী ছিলেন, স্যার?’—রানা জিজ্ঞেস করলো।

‘হুইসাইড করে হোক, আর যে ভাবেই হোক, যত্ন ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।’—দুঃখিত কঠ কমোডোরের, ‘ডক্টর নিজেও তা জানেন। যাবার আগে ম্যাকাইভার আমাদেরকে মেনে ফেলবেই। না মেনে কিভাবে রকেট এখান থেকে নিয়ে যাবে? কোনো উপায় নেই হত্যা ছাড়া। তবু কেন এ কাজ করলেন ডক্টর।’

‘আপনি যোদ্ধা, কমোডোর। আপনার মধ্যে রয়েছে ওয়ারিয়র স্পিরিট। ডক্টর বিজ্ঞানী। তার সাইটিফিক স্পিরিটের কথা আপনি অস্বীকার করতে চাচ্ছেন।’—রানা সমুদ্রের দিকে তাকালো। বললো, ‘আপনি ভুলে যাচ্ছেন স্যার, এটা ডক্টরের জীবনের স্বপ্ন। এ সার্থক দৃশ্যটি দেখার আশায় তিনি কত সাধনা করেছেন, একবার ভাবুন।’

‘আমি যোদ্ধা, রানা। আমি যত্নকেও পরাজয়ের গ্লানি দিয়ে ছোট করতে চাইনে।’—কঠোর কণ্ঠে আবেগ মিশালো।

রানা বললো, ‘না, আজ ডঃ বরকতের পরাজয়ের দিন ছিল না, ছিল জয়ের দিন।’—কি একটা কথা মনে হতেই বসে পড়লো। পায়ের জুতো এবং মোজা খুলে বের করলো সেলোফেন মোড়কে রাখা কাগজটা। এগিয়ে দিল কমোডোরের দিকে। বললো, ‘দেখুনতো স্যার, এটা কি? আমার মনে হয়, এটাই হবে দ্বিতীয় পিকিং ডাকের গতিপথ।’

কমোডোর কাগজটা হাতে নিয়ে পড়লো, ‘পঙ্গুইন হিরোশিম 2300/14030, জাপাতা-গ্রাণ্ডক্যানিয়ন 2936/13000’ এবং একটু ভেবে বললো, ‘জাপাতা একটা মেক্সিকান জাহাজের নাম। আমার মনে হয়, ছন্ন জোড়া নামই জাহাজের নাম। কিন্তু নাশ্বারঙলো কিসের?—সময়?’

‘না।’—রানা বললো, ‘টু থ্রি জিরো জিরো রাত এগারোটা হতে পারে। কিন্তু তার পরের প্রত্যেকটা নাশ্বারই চক্রিশের চেয়ে বেশি।

‘তবে কি এটা অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ নির্দেশক?’—কমোডোর ভাল করে দেখলো, বললো, ‘হ্যাঁ তাই। এভাবে পড়লে দাঁড়ান টু থ্রি পয়েন্ট ও, ও। মানে দাঁড়াচ্ছে তেইশ অক্ষ এবং বাকী অংশ—ওয়ান, ফোর, ও, পয়েন্ট থ্রি, জিরো মানে দ্রাঘিমা একশো চল্লিশ পয়েন্ট ত্রিশ।’

‘উত্তর-দক্ষিণ অথবা পূর্ব-পশ্চিম, কোন্ কক্ষ বা দ্রাঘিমা, স্যার?’

‘আমরা যদি উত্তর এবং পূর্ব ধরি তবে এ জায়গাটা মাত্র পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে এখান থেকে।’—কমোডোর মনোযোগ দিয়ে অস্ত্র অক্ষ এবং দ্রাঘিমাগুলো মিলাতে লাগলো। পিছন দিয়ে রানা দেখলো কোথায় আছে ম্যাকাইভার। না, কন্ট্রোল-রুম থেকে বের হয় নি।

‘হ্যাঁ, এগুলো এক এক জোড়া জাহাজই মনে হচ্ছে এবং এদের পজিশন হচ্ছে এখান থেকে তাইওয়ানের মধ্যবর্তী অংশে কয়েকশো মাইল ব্যবধানে।’—কমোডোর বললো, ‘এ জাহাজগুলো রকেটকে গাইড করে নেবার জগেই অপেক্ষা করছে, যাতে রকেট আক্রান্ত না হয়।’

‘যুদ্ধ জাহাজ?’

‘না, এতগুলো যুদ্ধ জাহাজ যদি এক সঙ্গে এখানে থাকে তবে উত্তর ভিয়েতনাম ও চাইনিজ রেডিওতে এতক্ষণে নিউজ প্রচার হয়ে যেতো, চাইনিজ নেভী এলাট’ হতো। যুদ্ধ জাহাজ নয়। তবে রাডার আছে এদের।’

‘রাডার ডিটেক্ট করতে পারে, কিন্তু গুলি নিশ্চয়ই ছুঁড়তে পারবে না। ...যদি রকেটের উপর এয়ার-এ্যাটাক চালানো হয়?’

‘আমার মনে হয়, রকেটকে নেবার জগে সাবমেরিন ব্যবহার করা হবে।’ কমোডোর বললো, ‘সাবমেরিনের টর্পেডো-ক্রমে এটা রাখা যেতে পারে।’

জাহাজ বোম্বার্ড সাবমেরিন এগিয়ে যাচ্ছে ফরমোজা-তাইওয়ানের

উদ্দেশ্যে। মুহুর্তের জন্ত ভাবলো রানা, একে রোধ করা যাবে না ঠিক সেই মুহুর্তেই রানার চোখ একটা আশ্চর্য জিনিষে আটকে গেল। ক্যাপ্টেন দিউ ! ক্যাপ্টেন দিউ-এর স্ত্রীনার পিঙ্ক প্যাংগার এগিলে আসছে ঘোঁপের দিকে।

রানা বললো, ‘কমোডোর, আপনি এখনি ম্যাকাইভারের কাছে অনুরোধ করুন যে, আপনাদের যেন এই বিকেল বেলাটা বাইরে থাকতে দেওয়া হয়। বুকিলে বলবেন যে, ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে তার চার-পাঁচ জন গাড’ লাগে। সমুদ্র পাড়ে একজন গাড’ই দূর থেকে পাহারা দিতে পারবে সবাইকে। ম্যাকাইভারের এখন কাজের লোক প্রয়োজন। আপনি তাকে কথা দেবেন যে, কোন গুণগোল হবে না।’

‘লাভটা হবে কি তাতে?’—কমোডোরের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি। কিন্তু রানার মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, ‘রানা তুমি কি সত্যিই রকেট আটকাবার চেষ্টা করবে?’

‘না, বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টা করবো, স্যার।’—রানা দাঁড়ালো না। ফিরে চললো ম্যাকাইভারের উদ্দেশ্যে। সব বিজ্ঞানীরাই এগিলে যাচ্ছে হাজারের দিকে। দ্বিতীয় রকেটের কাজ এবার শেষ করা হবে।

ম্যাকাইভার রানাকেই সবচেয়ে আগে সহযোগিতার জন্তে ধন্যবাদ জানালো। বললো, ‘স্বাক, আপনি কোন চালাকী করেন নি। আপনাকে বুদ্ধিমানই মনে করি। আর বুদ্ধিমানদের আমি বিশ্বাসও করি। তারা ভুল করে না। বুদ্ধিমানরা ভুল করতে পারে না।’

‘স্বাকসেস্‌ফুল?’—জিজ্ঞেস করলো ডঃ বরকত।

‘একবারে পুরোপুরি। ধন্যবাদ, ডঃ বরকত। আপনি প্রতিভাবান লোক।’—ম্যাকাইভার বললো, ‘এবার দ্বিতীয় রকেটের কাজটা শেষ করে দিন।’—কথাটা রানার উদ্দেশ্যেই বলা।

‘করতে পারি কিন্তু তার আগে মহিলাদের ও নেভীর লোকদের

ছেড়ে দিন।'—রানা বললো।

'ডক্টর মাসুদ, আগে আপনারা আপনাদের কাজ শেষ করুন তারপর অন্য কিছু ভাবা যাবে।'

'কি করবেন, তা আপনি আগেই ভেবে রেখেছেন।'—রানা বললো, 'সবাইকে হত্যা না করে দ্বীপ থেকে বেরুতে পারবেন না।'

'ন', হত্যা আমি করবো না, এ কথা আমি দিতে পারি।'—ম্যাকাইভার বললো, 'তবে বিজ্ঞানীদের স্ত্রী ও মিস চৌধুরী আমাদের সঙ্গে কিছুদূর যাবেন। কারো কোনো ক্ষতি হবে না। তাঁরা অন্ধত দেহে ম্যানিলা পৌঁছে যাঠেন আপনাদের কাছে-তিন দিনের মধ্যে। অবশ্য যদি রকেটে আপনারা কোন ট্রিস্ট না করেন।'

'শন্নতান!'—রানার ইচ্ছে হল, লোকটার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলে দেয়। এক পা এগিয়ে নিজেকে সংযম করলো।

'হ্যাঁ, আপনারা কাজ শুরু করুন। বেশি অসুবিধার সৃষ্টি করলে নেভীর লোকগুলোকে গুলি করা শুরু হবে। মিস চৌধুরীকে আপনার সামনে হত্যা করবো।'—ম্যাকাইভার বললো, 'আমি শন্নতানের চেয়ে জঘন্ট, হৃদয়হীন—আমার বন্ধুরাও বলতো।'

'মিস্ চৌধুরী কোথায়?'—রানা জিজ্ঞেস করলো। বললো, 'তার সঙ্গে দেখ করতে চাই।'

'না।'

'মিস্ চৌধুরী বেঁচে আছে?'

'আছেন।'

'আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।'—রানা বললো, 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না।'

ম্যাকাইভার এক মুহূর্তের জন্তে রানার চোখের দিকে চাইলো। তারপর ইশারা করলো ওয়াংকে। ওয়াং-এর বিশাল শরীরটা এসে

দাঁড়ালো রানার পিছনে। রানা পিঠে অনুভব করলো অটোমেটিকের স্পর্শ।

‘কি কথা বলবেন?’

‘প্রেম নিবেদন করবো।’—রানা বললো, ‘বিশ্বের কাগজ একটা জোগাড় হলেও প্রেম নিবেদন করার সময় পাই নি।’

‘ম্যানিলা ফিরেও সময় পাবেন।’—রেগে গেল ম্যাকাইভার।

‘আমি এখনই সময়টা চাই।’

‘দুই মিনিট সময়ে হবে?’

‘দু’মিনিট অনেক সময়।’

‘ওকে নিয়ে যাও।’—ম্যাকাইভার ওয়াং-এর উদ্দেশ্যে বললো কথাটা।

দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো গাড়’। রানা ভিতরে ঢুকলে, পিছনে ওয়াং।

সোহানা শুলেছিল ছোট নোংরা একটা বিছানার। দরজা খোলার শব্দে উঠে দাঁড়িয়েছে। পাংশু, শুকনো চেহারা। দুর্বল। অথচ তার মধ্যেই একটা উত্তেজনা ফুটে উঠলো চোখে-মুখে। রানা কাছে যেতেই বললো, ‘আমার জন্মেই ডঃ বরকতকে তুমি রকেটের ফিউজিং করতে রাজী করিয়েছো।’—সোহানার ঠোঁটটা কাঁপলো, ‘কেন এ ক্ষতি করলে?’

রানা সময় নষ্ট করতে চায় না। এক ঝটকায় বুকের মধ্যে টেনে নেয় সোহানাকে, গভীরভাবে চোখে-মুখে চুম্বন। সোহানা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে পারে না। রানার হাত তার পিছনে স্নায়কসের বেটে কিছু একটা গুঁজে দিচ্ছে। প্রথমটার হঠাৎ স্তম্ভ হয়ে যায় সোহানা, তারপরেই তার হাত দু’টো সক্রিয় হয়ে ওঠে, জিভটা রানার দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেয়। ত্রিশ সেকেন্ড কেউ কোন কথা বলে না।

সোহানা দম নিতে নিতে উচ্চারণ করলো, ‘রানা, রানা!’—বুকে মুখ

দ্বয়লো, চুমু খেতে লাগলো। তারপর মুখ তুলে তাকালো।

সোহানাকে ভাল করে দেখলো রানা। বললো, ‘এখানেও পোষাক বদল করেছে। দেখছি!’—সোহানার পরনে লাল শার্ট, কালো প্যান্ট। সকালে ছিল নেভীর বেটপ আকারের পোষাক।

সোহানা আবার মুখ ঝুঁজে দিল রানার কাঁধে। বললো, ‘এরা দিয়েছে। কোচিমা এনে দিয়েছে। কোন বিজ্ঞানীর স্ত্রীর কাছ থেকে।’

রানা বললো, ‘জ্ঞানালার শিকড়লো খুব মোটা নয়। আজ সারারাত ধরে ওটা কাটতে থাকবে। কেমন?’—পিছনের বেটে চাপ দিল।

বাংলায় কথা বলছিলো ওরা। ওয়াং বাধা দিল না প্রেমালাপে।

‘কিন্তু রানা, শুধু আমার ঘর থেকে বেরুলেই তো আর হবে না! ওরা সবাইকেই ঘেরে ফেলবে বা সঙ্গে নিয়ে যাবে।—জানো, কোচিমার আসল নাম মীরা দিউ। পিক-প্যাটারের ক্যাপ্টেন দিউ-এর মেয়ে।’—সোহানা রানার কানের কাছে মুখ রেখে বলতে লাগলো, ‘ও আমাকে সব বলেছে। ক্যাপ্টেন দিউ চাইনিজ নেভীর হয়ে কাজ করে। ভদ্রলোক ইন্দোনেশীয়ার বিখ্যাত কমিউনিস্ট। ওখানকার বর্তমান সরকার এখনো তাকে খুঁজছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন কষো-ডিয়ান্ন আশ্রয় নিয়েছে। মীরা-পিকিং-এ বিদেশী ভাষার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো। ওখানে ম্যাকাইভার জার্মান ভাষার অধ্যাপকের কাজ করতো, ম্যাকাইভারের প্রেমে পরে ও। এবং ক্রমে আবিষ্কার করে গুপ্ত-চক্রের কথা। এই চক্রের সঙ্গে চাইনিজ নেভীর যোগাযোগের কথাও জানতে পারে। ও তখন প্রেম এবং এ্যাডভেঞ্চারের বোঁকে এতে নেমে পড়ে। ও প্রথম দিকে শুধু খবর সংগ্রহ করে দিত ম্যাকাইভারকে। তার পরিবর্তে ম্যাকাইভার ওকে শুনাতো প্রেমের আশ্চর্য সব কথা। এবং ওকে গ্রেটা আইল্যাণ্ডে কাজ করার জগ্গে রাজী করায়। ওর বাপকে ব্ল্যাকমেইল করতে সাহায্য করে। ওর বাপ জানে এরা ওকে

বলী করে রেখেছে, কিন্তু কোথায় রেখেছে তা জানে না। ক্যাপ্টেন
সে জেগেই ম্যাকাইভারকে সাহায্য করছে। চাইনিজ নেভীর একজন
ভাইস এ্যাডমিরাল, নাম হচ্ছে—।’

‘নামটা মনে রেখো, পরে প্রয়োজন হবে।’—রানা আশে করে
বললো। এবং সোহানার চোখে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। চুল-
গুলো সরিয়ে দিলো।

‘রানা, কোচিমার এত কথা আমাদের বলার মানে বুঝতে পারছো?’
—সোহানা বললো, ‘এরা আমাদের কাউকেই বাঁচতে দেবে না।’

‘না সোহানা, এতক্ষণ পর মনে হচ্ছে আমরা বেঁচে যাবো। এই
প্রথম ভাবছি, আমরা বেঁচে থাকবো।’—রানা আবার চুমু খেল।
এবার সত্যিকারের চুমু পুষ্ট্যের কামনার আবেগ অনুভব করতে
লাগলো সোহানা। সোহানাও রানার কামনার নিজেই এক কল্পে
দিলো।

‘ডঃ মাসুদ!’—ওয়াং ডাকলো। বললো, ‘আপনার প্রেমের সমস্যা
পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে।’

রানা ফিরে দাঁড়িয়ে ওয়াং-এর ঠোঁটের কোণে হাসি দেখতে পেল।
এই প্রথম ও হাসতে দেখলো লোকটাকে।

‘চলুন। যাই বলুন, দেশী ভাষা ছাড়া প্রেম করা যায় না।’—
রানা বললো, ‘বিনে পরসায় কিন্তু বেশ এনজয় করলেন মিস্টার ওয়াং।
নট এ ব্যাড শো আই থিক!’

ওয়াং-এর ঠোঁটের হাসিটা উধাও হল। আবার নীরব নির্ভুরতা
নেমে এলো ভাঙাচোরা মাংস-পেশীতে। চোয়ালের মাংস পাক
থেকে উঠলো। বললো, ‘আউট!’

রানা ওয়াং-এর সামনে সামনে আর্মারী থেকে ছাঙ্গারের দিকে
একিয়ে যেতে যেতে দেখলো, ক্যাপ্টেন দিউ-এর পিছ-পাশায় এখন

অনেক কাছে এসে গেছে। কিন্তু ওটা জেটিতে থামলো না। কারণ, হরতো জেটি ফাঁকা রাখা হচ্ছে অন্ন জাহাজের ভণ্ডে।

রানা খেয়াল করলো, কিছুক্ষণ ধরে কোচিমাকে দেখছে না।

ম্যাকাইভার এবং বিজ্ঞানীরা রানার জন্যে অপেক্ষা করছিল। রানা ও ডঃ বরকত উঠে গেল লিফটে। রানা খুলে ফেললো ভেতরের আবরণের উপরের জংশন-বক্স। ডঃ বরকত হাসলো, ‘ভুড।’ —এবং রোটোরী ক্রকের টাইম এ্যাডজাস্ট করে দেখলো ডেসট্রাক্ট বক্স ‘সেফ’ পজিশনে রয়েছে। তাকালো ডঃ বরকতের দিকে। ডক্টর কিছু বললো না। এটা-সেটা কাজ শেষ করলো দ্রুত হাতে ডক্টর। তারপর আবার নজর দিল ডেসট্রাক্ট বক্সের দিকে। রানাকে জুইচগুলো দেখতে বললো। রানা আগের বারের মত জুইচগুলো চেক করলো কিন্তু তার চোখ এড়ালো না, ডঃ বরকত দ্রুত হাতে ডেসট্রাক্ট বক্সের জুইচ ও কভারের মাঝখানে এক টুকরো তার ভরে দিল। বললো, ‘চাবি?’

রানা চাবি চাইলো ম্যাকাইভারের কাছে, ডেসট্রাক্ট বক্সের চাবি। ম্যাকাইভার ছুঁড়ে দিল চাবিটা।

কভার খুলে ফেললো।

জুইচের প্যাঁচ খুলে আবার লাগালো ডক্টর বরকত। লাগাবার সময় ঘুরিয়ে দিল ১৮০°।

রানা দেখলো, পুরোপুরি ব্যাপারটা রিভার্স হয়ে গেল। ‘সেফ’ এখন ‘আর্মড’ হয়ে গেল। ডঃ বরকতের মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। কিন্তু কপালে ঘাম দ্রুত দ্রুত করে নামছে।

রানা দ্রুত-হাতে ডেসট্রাক্ট বক্সের ঢাকনা লাগিয়ে চাবি দিল ‘সেফ’ পজিশনে রেখে। ওয়াং-এর দিকে চাবি ছুঁড়ে দিল।

ম্যাকাইভার বললো, ‘এক সেকেন্ড, ডঃ মাসুদ।’

উপরে উঠে এলো ম্যাকাইভার ।

ঝুঁকি পড়লো ডেসট্রাক্ট স্নাইচের উপর। ‘সেফ’ পজিশন থেকে চাপ দিয়ে ‘আর্মড’ পজিশনে নিতে চেষ্টা করে পারলো না। খুশী হলে বললো, ‘ঠিক আছে।’

ডক্টর ভেতরে ঝুঁকি পড়ে একটা তার এনে সোয়েনবেড-এর সঙ্গে যুক্ত করলো। এবং সোজা হয়ে রানাকে দরজা টেনে দিতে বললো। রানা দরজাটা টেনে বন্ধ করতে গেলে ডক্টর ধরে ফেললো। দু’হাত হ্যাণ্ডেলের দু’দিকে রেখে ভেতরটার উঁকি দিল। রানা হাতটাকে ওরাং-এর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে ভেতরে উঁকি দিল—সে-ই তো দেখবে, ডঃ বরকত কোনো ক্ষতি করে কিনা। দেখলো, ভেতরের হাতটা হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে কিছু একটা জড়িয়ে দিচ্ছে।

দরজা বন্ধ করলো রানাই।

ম্যাকাইভার বললো, ‘অলরাইট?’

রানা বললে, ‘মোর স্থান অলরাইট।’

বের হয়ে এল হ্যাঙ্গার। ডঃ বরকত বাংলায় শুধু বললো, ‘এ রকেট কোন কাজে আসবে না।’

রানা বললো, ‘যদি আমরা বেঁচে থাকি, যদি কন্ট্রোল-বোর্ডের ডেসট্রাক্ট স্নাইচে চাপ দিতে পারি?’

‘না। চাপ না দিতে পারলেও ক্ষতি নেই। কন্ট্রোল-বোর্ড’ হাতে পেলো তো রেডিওতেই আর্মড করা যেতো। এটা করে দিলাম এই জন্তে যে দরজাটা চার ইঞ্চি ফাঁক হলে দেড় পাউণ্ড প্রেসার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো রকেটে স্নাইসাইড চার্জ হয়ে যাবে।’—যদুকণ্ঠে খুব স্বাভাবিকভাবেই ডঃ বরকত বললো কথাগুলো।

ডঃ খান এসে দাঁড়ালো রানার পাশে। বললো, ‘এবার কি হবে?’

অর্থাৎ তাদের জীবনের আর কোন মূল্য নেই এদের কাছে। সব কাজই শেষ। রানা দেখলো, ক্যাপ্টেন দিউ-এর ক্রুনার থেমেছে একটা কোরাল-রীফের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন লাইফ-বোটে করে এগিয়ে আসছে একা।

রানা আশে-পাশে কোচিমাকে দেখলো না। একেবারে উধাও হয়ে গেল নাকি মেয়েটা। সোহানা বলেছে : ক্যাপ্টেন জানে না, কোচিমা এখানেই আছে।

দেখলো ম্যাকাইভার এবং ওয়াং তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেনের আগমন পথের দিকে। ওদের চোখে-মুখে একটা গোপন উদ্বিগ্নতা দেখতে পেল ও। দেখলো, নেভীর লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সমুদ্র পাড়ে। গার্ডরা বেশ দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ‘বাহ্ ! ওদের একটু বিকেলের রোদে বেশ চরিয়ে নিচ্ছেন দেখছি !’—রানা বললো ম্যাকাইভারের উদ্দেশ্যে।

ম্যাকাইভার উত্তর দিল, আপনিও চরতে পারেন, ‘অবিশ্যি সম্ভার আগে পর্যন্ত।’

রানা ‘ধন্যবাদ’ বলে এগিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে। ডক্টর বরকত পাশে চলতে চলতে আপন মনে যেন বললো, ‘মেজর মাসুদ, আপনি বিজ্ঞানী সঙ্গে নিজে বিপদে পড়লেন, তারচে’ বিপদে ফেললেন মিস্ চৌধুরীকে।’

‘কেন?’

‘ম্যাকাইভার সবাইকে রেখে গেলেও মিস্ চৌধুরীকে ছাড়বে না। অথচ আররনি হচ্ছে আপনি বিজ্ঞানী না, হয়তো প্রেমিকাও না। যেচারা মিস্ চৌধুরী।’

রানার চোখ তখন ক্যাপ্টেনের উপর। ডক্টরের কথায় থমকে গেল। একটু হাসলো। বললো, ‘ডক্টর, আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা খুব ভাল না দেখছি !’

প্রথমে একটু চূপ করে থাকলো ডঃ বরকত। তারপর বললো, ‘না,

‘এটা ঠিক না। আপনার সম্পর্কে ধারণা করার মত পরিচয় না হলেও বুঝেছিলাম প্রথম দেখাতেই, আপনি কিছু একটা করতে চান। আপনাকে বিশ্বাস করি বলেই ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করলাম আপনার উপর নির্ভর করে।’

‘আপনি যে ভাবে ফিউজিং করেছেন তাতে। কারো সাহায্য ছাড়াই পারতেন আগেও।’

‘পারতাম কিন্তু সাহস পাই নি। কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। ডঃ মলিনকে ম্যাকাইডার ঠিক সাত দিন আগে হত্যা করেছে। এই সাত দিন আমার উপর অত্যাচার করেছে অনেক, রেবেকাকে হত্যা করেছে আমার সামনে এবং আমাকে বন্দী করেছে। পাগল সেজেছি, কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি।’—ডঃ বরকত বললো, ‘কন্ট্রোল রুম থেকেই সমুদ্রে রকেটটা রেডিও মারফত এক্সপ্লোড করার পক্ষপাতী আমি ওরা রকেট নিয়ে যাবে কোন লোকালয়ে, কারখানায়। সেখানে এটা এক্সপ্লোড করলে অকারণে, নিরীহ লোক, শিশু, মহিলা মারা পড়বে, তা আমি চাই না। এ কথাটাই শূধু আমি বলতে চাই, মেজর। এর জন্য আমি আপনার উপর নির্ভরশীল।’

রানা অবাক হয়ে দেখলো ডঃ বরকতের মুখ।

শূধু বেঁচে থাকার কথা না, আরো অনেক কিছু চায় ডক্টর। এটা কি একটু বেশি চাওয়া না? রানা ভাবলো।

দেখলো, ক্যাপ্টেন এগিয়ে আসছে। রানাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। ‘কিন্তু তার আগেই একজন গার্ড এসে ডেকে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেনকে।

রানা বালিতে বসে পড়লো। পাশে কমোডোর গভীর হয়ে শূধু আছে। রানা বললো, ‘কমোডোর, স্যার কিছু বুঝতে পারছেন?’

‘কোনও উপায় রেখেছেন কি ডঃ বরকত?’—কমোডোরের কণ্ঠ উঠল।

‘ডক্টরকে বাদ দিন ।’—রানা বললো, ‘আমাদের ভরসা, একমাত্র ভরসা হচ্ছে ক্যাপ্টেন দিউ ।’

‘ক্যাপ্টেন দিউ—পিকপ্যাছারের ?’

‘হ্যাঁ ।’—রানা উঠে বসলো । দেখলো ক্যাপ্টেন এগিয়ে আসছে আবার । উঠে দাঁড়ালো রানা । বললো, ‘এবার একটা ফাইট দেখার জন্তে প্রস্তুত হন, কমোডোর ।’—বলেই রানা এগিয়ে গেল ফাঁকা জায়গাটার ।

কাছে আসতেই রানা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্যাপ্টেনের উপর । ক্যাপ্টেন পড়ে গেল মাটিতে । রানা কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, ‘আপনি একজন কমিউনিস্ট হয়ে এদের সঙ্গে মহযোগিতা করছেন ! আপনি জানেন আপনার মেন্নেকে এর। বশ করে আপনার ক্রকমেইল করছে ? আপনি যে আশায় এদের সাহায্য করছেন তা পূর্ণ হবে না, আপনার মেন্নেকে আপনি পাবেন না ।’

ক্যাপ্টেন বুঝলো ব্যাপারটা । সে কিছু বোঝার জন্তে প্রস্তুতই ছিল । নইলে এত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারতো না । খপ্ করে রানার চুলের মুঠি ধরলো, ফেলে দিতে চেষ্টা করলো নিচে ।

কয়েকজন গাড় দৌড়ে এলে । ওরা দু’জন গড়াতে গড়াতে কিছুটা দূরে গিয়ে পড়লো । ক্যাপ্টেন গাল দেবার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, ‘আমার মেন্নেকে আমি উদ্ধার করবোই । আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি । এখন আপনার সাহায্য চাই । আমার লোকেরা, আকিকো আর নেঙচি আসছে পাহাড়ের স্তরঙ্গ দিয়ে ।’—ক্যাপ্টেন রানার পকেটে কি যেন খুঁজে দিল । বললো, ‘লুগার । রাত দু’টো বাজলে ওরা ঢুকবে ।’

ক্যাপ্টেন ডিগবাজী খেয়ে একদিকে ছিটকে পড়লো । রানা তাকিয়ে দেখলো, ক্যাপ্টেনের হাতে আরেকটা পিস্তল, দেই বিশাল মাউজার । ওটা নেড়ে চীৎকার করছে, ‘আই উইল শূট ইউ, আই উইল কিল

ইউ ! ইউ ব্লাডি...!

ম্যাকাইভার হাসছে হাঃ হাঃ করে। ওয়াং এস ধরে ফেললো ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো, 'না, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি ঐ হারামীর বাচ্চাকে খতম করে আজ অল্প কাজ করবো।'।

ওয়াং চ্যাংদোলা করে সরিয়ে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেনকে।

রানাও দু'টো গাল দিয়ে থু থু ছিটালো। দেখলো ম্যাকাইভার হাসছে তখনো। বললো, 'ডঃ মান্নদ, সময় থাকলে কুস্তিটা এনজয় করা যেত।'।

ওয়াং এবং ক্যাপ্টেনের গমনপথে তাকিয়ে আবার বললো, 'ক্যাপ্টেন বড় বেশি চালাকী করতে গিয়ে বোকামী করে ফেলেছে?'

রানা চমকে ম্যাকাইভারের দিকে তাকালো। বললো, 'কেন?'

'চাইনিজ নেভীর হেড-কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে এস. ও. এস. পাঠিয়েছে, আমাদের জাপাতা তা রিসিভ করে। ও ভাবছে, চাইনিজ নেভী আসবে। কিন্তু—'—হাসলো ম্যাকাইভার, 'যাঁর পাঠাবার দায়িত্ব তিনি অল্প কিছুই করবেন।'।

রানা ভাবলো, এখন ইচ্ছে করলে এ লোকটাকে শেষ করে দেওয়া যায়। পকেটে হাত না দিয়েও লুগারের অবস্থান অনুভব করলো। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'ক্যাপ্টেনও তো আপনার লোক?'

'হ্যাঁ', আমাদেরই লোক। কিন্তু বড় বেশি আদর্শবাদী।' —ম্যাকাইভার বললো, 'এখানে এসেছে মেয়েকে উদ্ধার করতে।'—কঠোর বিজ্ঞপের ছোঁয়া।

'মেয়েকে?'

'কোচিমা। মীরা দিউকে।'—ম্যাকাইভার বললো, 'আমাদের একান্ত অনুগত-কর্মী। ক্যাপ্টেন জানতো না, তার মেয়েই তার সঙ্গে ত্র্যাকমেইল করছে। জানতো না, এ ধীপেই আছে। ওর সঙ্গে কথা

আছে, আগামী কাল ম্যানিলায় মেয়েকে তার হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু আজ আমার কুঠিতে গিয়ে আমাদের না পেয়ে ঘরগুলো খুঁজতে যায়। সেখানে সম্ভবতঃ মীরার কাপড় চোপড় দেখে চিনতে পারে। আমার সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করে রেডিওতে। আমি ওকে বলেছি, মেয়েকে এখন থেকে নিয়ে যেতে।’

‘মীরা, যাবে?’

‘ভালো প্রশ্ন।’—ম্যাকাইভার বললো, ‘এ প্রশ্নটাই ওর বাব’, এই ক্যাপ্টেন ভাবতে চায় না। হ্যাঁ, প্রশ্ন হচ্ছে, মীরা যাবে কিনা? না, মীরা যাবে ন। কোথায় যাবে? ওর বাবা ওকে এখন থেকে বের করে নিয়ে গেলেও রক্ষা করতে পারবে না। চাইনিজ সিকিউরিটি পুলিশ ওকে ছাড়বে?’

‘তবে ওকে ডেকে পাঠালেন কেন? রবটের কথা তো ক্যাপ্টেন জানে না!’

‘না, জানে না। ডেকে পাঠিয়েছি আমাদের সিকিউরিটির জন্তে। আমাদের লোক নেভীতে না থাকলে এতক্ষণ হয়তো নেভী রওনা হত আমাদের উদ্দেশ্যে। ক্ষতিকর লোক এই বোকা ক্যাপ্টেন। ও অল্প কারো সঙ্গে হাওয়ায় করার চেষ্টা করতে পারে।’—ম্যাকাইভার বললো ‘তাছাড়া ওর জুনারটাও আমাদের দরকার।’

‘কেন?’

‘আমাদের য কোয়েস্টার রাতে এসে পৌঁছাবে সেটা এত কম পানিতে জেঁতে নোঙর করতে পারবে না। এই জুনারে করে নিয়ে ওটাতে তুলতে হবে।’

‘তবে কোয়েস্টারের কি দরকার ছিল?’—রানা বললো, ‘অবশি কোয়েস্টারে কেন থাকে। কেন ছাড়া সাবমেরিনে তুলতে পারবেন না পিকিং ডাক।’

ম্যাকাইভার অবাক হল। এবং বললো, ‘আপনি বিজ্ঞানী ডঃ মান্নদ, অথচ মাথা অস্ত্র দিকে বেশি ঝাটান।’

ম্যাকাইভার গার্ডকে ডেকে নির্দেশ দিল সবাইকে ঘরে নিয়ে যেতে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

নেভীর লোকদের লাইন করে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল গার্ড। এবং সবাইকে সার্চ করতে লাগলো।

রানা পকেটের ল্যাগারটা স্পর্শ করলো।

আরেকজন গার্ড বিজ্ঞানীদের এক জায়গায় হতে নির্দেশ দিল।

না, সার্চ করা হল না নিরীহ বিজ্ঞানীদেরকে — এবং ডঃ মান্নদ রানাকে।

ডঃ খান বললো, ‘এরা অত্যন্ত অরগ্যানাইজড, আমাদের বাঁচার কোনই উপায় নাই, মাই বয়।’

‘হ্যাঁ, কয়েক ঘণ্টা সময় ছাড়া আমাদের হাতে কিছুই নেই।’—রানা উত্তর দিল। বললো, ‘পুরো রাতের অন্ধকার আমাদের হাতে, ডক্টর খান।’

হাসলো ডঃ খান। বললো, ‘তুমি বড় বেশি আশাবাদী, রানা। এই ক্ষেত্রেই তোমাকে আমি ভালবাসি।’

‘রাত দুটো।’—রানা উচ্চারণ করলো, আবার স্পর্শ করলো ল্যাগারের শীতল অবস্থান।

রাত ঠিক ন'টায় খাবার দেওয়া হল।

ম্যাকাইভার সবাইকে শুবরাত্রি জ্ঞাপনের জন্তে এল। চেহারা প্যাণ্টে গেছে। দাড়িহীন, বলিরেখাহীন সুপুরুষ ম্যাকাইভার। নেভীর পোষাক পরেছে। হাতের ছড়িটা ঠিকই আছে। এবং অস্ত্র হাত সজিনীর নিতম্বে মাঝে মাঝে চাপ দিচ্ছে।

কোচিমাকে ম্যাকাইভারের পাশে দেখা গেল অনেকক্ষণ পর।

মেয়েটির চোখে আগের আদিমতা অথবা হিংস্রতা যেন নেই, রানা।
এদখলো বিষয় দু'টো চোখ। বাবার জন্তে মেয়েটি দুঃখিত।

রানা একটু ভাবলো। চোখে চোখে তাকালো কোচিমার। বললো,
'মিস্ মীরা দিউ, আপনার বাবার ভাগ্যের জন্তে আমি দুঃখিত, যদিও
আমাদের দু'জনের ভাগ্যেই এক।'

সপাং করে শব্দ হল একটা।

রানার সকালের কাঁচা ঘাসের উপর এসে পড়েছে ম্যাকাইভারের
হাতের বেত।

এগিলে এল গার্ড।

ম্যাকাইভার চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'ডঃ মাসুদ, আপনাকে আমার আত্ম প্রয়োজন নেই। বেশি বাড়াবাড়ি করলে সবার সামনে ওয়াং আপনার মাথা ঝুঁড়ো করে দেবে।'

রানা বললো, 'ভয় দেখাতে চেষ্টা করো না, ম্যাকাইভার। আমরা মরবো জানিই।'

'না, আপনারা মরবেন না। আপনাদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত দেবো ভেবে দেখতে, আটজন মহিলা, আপনাদের স্ত্রী অথবা প্রেমিকা আমাদের হাতে মারা পড়ুক এটা চান কিনা।'—ম্যাকাইভার বললো, 'আপনারা তা চাইবেন না, জানি।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমি একজন বিজ্ঞানী?'

'না করার কোন কারণ দেখি না।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমি একজন প্রেমিকা?'

'করি

'তবে এটুকুও বিশ্বাস করুন, আপনার হাতে পড়ার চেয়ে আমাকে প্রেমিকাকে আমি হত্যা করাই পছন্দ করবো।'

'আমরা যদি বেঁচে থাকি,'—ম্যাকাইভার বললো, 'আপনার প্রেমিকাকে পৌঁছে দেওয়া হবে ম্যানিলা, এ বিশ্বাস আপনি করতে পারেন।'

'না, করি না। সবাই হয়তো ম্যানিলা পৌঁছাবে, কিন্তু মিস্ চৌধুরী নয়।'—রানা বললো, 'মিস্ চৌধুরী ইজ ইয়াং এ্যাণ্ড বিউটিফুল। আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়েই আমি একথা আরো ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলাম।'—রানা তাকালো কোচিমার চোখে। বললো, 'মিস্ দিউ-এর কাজ শেষ হয়ে গেছে। তার বাবা এখন স্বন্দী। এবং আপনি মাংসাশী জীব বিশেষ।'

আবার এসে বেতটা পড়লো রানার গালে। আবার উঠলো।

কোচিমা ধরে ফেললো। বললো, ‘বাজে কথার উত্তেজিত হনো না, ডালিং!’

বাঁ হাতটা কোচিমার কাঁধে রেখে ম্যাকাইভার শান্ত হবার চেষ্টা করলো। গার্ডকে চীৎকার করে হুকুম দিল সবাইকে ঘরে নিয়ে আটকাতে। বাইরে বেরিয়ে ম্যাকাইভার কোচিমার কানের কাছে বললো, ‘আই লাভ ইউ ডালিং। ওর কথার তুমি বিশ্বাস কর?’—হাত চাপ দিল নিতম্বে। আঙ্গুলগুলো খামচে ধরলো নরম মাংস।

উত্তর দিল না কোচিমা। শুধু হাতটা সরিয়ে দিল।

রাতটা ভীষণ অন্ধকার। চারদিকে কিছু দেখা যায় না। কোচিমা বা মীরার মুখটাও দেখতে পেল না ম্যাকাইভার।

ওদের দু’টো ঘরে রাখা হয়েছে। নেভীর লোকদের বড় ঘরটায়, এবং মাকের করিডোরের ওপাশে অল্প ঘরে বিজ্ঞানীদের। করিডোরে দু’জন গার্ড, দু’ঘরের দরজার সামনে পায়চারী করছে।

অন্ধকারে এই শেডের চার কোণে চারজন দাঁড়িয়ে আছে সজাগ দৃষ্টি রেখে।

রাত দু’টো।

ক্যাপ্টেনের স্কুনারে তোলা হচ্ছে রকেট। অনেকের ব্যস্ততা। শঙ্কা সাবধান বাণী।

রাত দু’টো।

করিডোরে পায়চারী করছে গার্ড দু’জন। একজন থমকে দাঁড়ালো। নক হল ভেতর থেকে। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল খাতা দিয়ে। তারপর দরজার দাঁড়ালো অটোমেটিক কারবাইন উঁচু করে ধরে।

‘বিষ খেয়েছে আমাদের ডক্টর বরকত।’—রানা বললো, উত্তেজিত

কঠে ।

চাইনিজ গার্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো । চাইনিজ ভাষার কথাটা আবার বললো চাইনিজ বিজ্ঞানীদের একজন ।

এবার এগিয়ে এল গার্ড ।

মেঝেতে পড়ে আছে ডঃ বরকত । লেফটেন্যান্ট-সার্জন সান-চিয়াং তার ব্যাগ নিয়ে পাশে বসেছে । খুঁকে পড়লো গার্ড । সার্জন সান-চিয়াং খণ্ণ করে কারবাইনের মাথাটা ধরে বলে উঠলো, 'তোমরা এটাকে একটু দূরে রাখতে পারো না, প্রভুভক্ত কুস্তার দল ।'

একটু অবাক হলো গার্ড, সঙ্গে সঙ্গে গলার কাছে একটা শীতল স্পর্শও পেল । গিস্তল !

'সোজা হয়ে দাঁড়াও । টু' শব্দ করলে একেবারে শেষ হয়ে যাবে ।'

করিডোর ।

ও পাণের দরজার শব্দ হলো । চাবি দিয়ে দরজা খুললো একজন গার্ড । দরজা খুলতেই একটা হৈ-চৈ শুনতে পেল সে ।

দেখলো কে যেন মেঝেতে পড়ে আছে ।

অনেকগুলো কঠ বলে উঠলো, 'কলেরা !'

ওপাশের ঘরে কিছু একটা পতনের শব্দ ঘুরে দাঁড়ালো গার্ড ।

সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার উপর পড়লো শক্ত একটা কিছু ।

নেভার লেফটেন্যান্টের হাতে মদের বোতলের মাথা ধরা । গোড়াটা ভেঙে হাতে রয়ে গেছে । আজ খাবার টেবিল থেকে এটা নিয়ে এসেছিল ।

পনেরো মিনিট পর ।

কালো গাভের পোষাকে করিডোরে এসে দাঁড়ালো রানা ও একজন চাইনিজ নেভীর লোক, লাও। লাও এগিয়ে গেল দরজার দিকে দ্রুত পায়ের। বের হয়ে অন্ধকারে কাকে যেন ডাকলো। তারপরেই দেখা গেল ডবল মার্চ করে ফিরে আসছে। পিছনে আরো দু'জন গাভ'। তিনজনেরই কারবাইন উঁচু করে ধরা। দৌড়ে ঢুকে পড়লো ওরা বিজ্ঞানীদের ঘরে। কারবাইনের বাট তুলে মারলো রানা পিছনেরটার কানের কাছে। লাওয়ের কারবাইন লাগলো তার পিছনের জনের কণ্ঠে। পতনশ্রুতি দেহ দু'টো ধরে ফেললো ওরা, শূইয়ে দিল মাটিতে।

দশ মিনিট পর। দু'জন গাভ' গিয়ে দাঁড়ালো বাইরের অন্ধকারে। ওদের একজন রানা।

দু'মিনিট পর।

সার্জেন সান-চিয়াং বের হয়ে এল ডাক্তারী ব্যাগ হাতে।

পিছনে দু'জন কালো পোষাক পরা গাভ'। এগিয়ে চললো সার্জেন। কারবাইন তার পিঠে ঠেকানো রয়েছে।

বাঁ দিকে সোজা ওরা এগিয়ে গেল লম্বা শেডের দিকে। মহিলাদের ওখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

কমোডোর বের হয়ে এল কারবাইন হাতে। তার পেছনে ডঃ সেলিম খান, তারপরে সবাই। সবার শেষে এলো ডঃ বরকত। সবাই হামাগুড়ি দিয়ে উত্তরের পাহাড়ের দিকে এগোলো। নেভীর লোকেরা মাটিতে গাড়িয়েই যাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের হামাগুড়ি দিতেও কষ্ট হচ্ছিলো।

ওরা উত্তরের পাহাড়ের গা ঘেঁষে এগিয়ে যাবে শুড়ছে।

ওরা এগিয়ে গেলে রানা দেখলো দু'রকম শেডের দিকে। সজী লাওকে বললো, 'তুমি এখানে দাঁড়াবে। মহিলারা উত্তরের দিকে

চলে গেলে তুমি সোজা পথে ঝড়ফে যাবে। পাথরের ফাঁকে অপেক্ষা করবে। কেউ ওদের যদি বাধা দেয় গুলি চালাবে। এবং ওরা ওহায় ঢুকলে তুমি ঢুকবে।’ লাও সম্মতি জানালো মাথা নেড়ে।

রানা এগুলো আর্মারীর দিকে।

হিসাব করে বের করলো সোহানার ঘরের জানালা। অঙ্ককারে উঠে দাঁড়ালো। দেখলো, ইয়া, এটাই। জানালার একটা শিক কাটা হয়েছে, কিন্তু পুরোটা নয়।

সোহানার বিছানা খালি।

সোহানা নেই।

অঙ্ককারে য়দু আলোকিত জানালার শিকগুলো বিজ্ঞপ করে উঠলো। ত্রিশ সেকেন্ড শুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রানা। পুরো ব্যাপারটা অনুমান করার চেষ্টা করলো। কিন্তু একটা ভয়ের অনুভব ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারলো না।

রাত দু’টো পনেরো। স্কনার। ক্যাপ্টেনের কেবিন।

চীৎকার করে উঠলো ক্যাপ্টেন দিউ, ‘আমি তোমাকে শেষ বারের মত বলছি, আমার মেয়েকে তুমি ছেড়ে দাও, ম্যাকাইভার। নইলে ...তোমাকে আমি খুন করবো!’

‘কিন্তু আপনার মেয়ে যাবে না।’—ম্যাকাইভার ঘরের কোণে মাথা নিচু করে বসে থাকা কোচিমাকে দেখালো। বললো, ‘ও চীনে ফিরতে পারবে না।’

‘ও যেখানে ফিরতে পারবে সেখানেই আমি নিয়ে যাব, ম্যাকাইভার। আমি সমুদ্রের মানুষ। আমরা সমুদ্রে সমুদ্রে থাকবো। ও অবুক, ওকে তুমি ভুলিয়েছো। ও আমার একমাত্র মেয়ে, ওর

মা মরে যাবার সময় আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলো ওকে।’
—মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো ক্যাপ্টেন, ‘আমাকে দয়া কর,
ম্যাকাইভার।’

‘দয়া আপনাকে আমি করতে পারি না ক্যাপ্টেন। আপনার
কুনার আমার প্রয়োজন, এর প্রয়োজন শেষ হলে আর দয়ার প্রশ্নই
উঠবে না। আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আপনার মেয়ে যদি
যেতে চায় তাও দেওয়া হবে।’

‘আমি যাবো আপনাদের সাথে, আমি কথা দিচ্ছি। ওকে এখানে
রেখে যান।’

‘এখানে?’—এবার কোচিমা বললো, ‘এখানে পাকিস্তানী চীনাদের
হাতে? ওরা আমাকে ছেড়ে দেবে?’

‘দেবে—তুমি ক্যাপ্টেন দিউ-এর মেয়ে।’—ক্যাপ্টেন বললো, ‘তুই
ভুল করিসনে মা। রকেটের সঙ্গে থাকিসনে।’

‘কেন?’—ম্যাকাইভার চমকে প্রশ্ন করলো।

‘আপনি বুদ্ধিমান লোক, ম্যাকাইভার। আপনার বোকা উচিত
ছিল, ডক্টর মাসুদ শুধু শুধু ফিটজিং করে নি রকেটে। রকেট নিয়ে
যেতে পারবেন না আপনি।’—ক্যাপ্টেন বললো, ‘রানা ডেসট্রাক্ট বাটন
ব্যবহার করবেই।’

‘না, করবে না।—আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনিও জানেন। এখানে
মিস্ চৌধুরী থাকবে, থাকবে বিজ্ঞানী পরীরা। ওরা থাকবে ঘরে
বন্দী। গাড়’ থাকবে কন্ট্রোল-রুমে। প্রয়োজন হলে ওদের সবাইকে
হত্যা করবো।’

‘কিন্তু...’—ক্যাপ্টেন ঘড়ি দেখলো। বললো, ‘ঠিক দু’টোর আমার
দশজন সশস্ত্র লোক এখানে প্রবেশ করেছে অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রকারে।
এখন দু’টো বিশ।’

‘স্বপ্ন দিয়ে!’—হাসলো ম্যাকাইভার হোঃ হোঃ করে। হাসি হঠাৎ থামিয়ে বললো, ‘ওরাঃ সন্ধ্যায় স্বপ্নের মাঝখানটা বন্ধ করে দিয়েছে পাহাড় বসিয়ে।’

স্বপ্ন হয়ে গেল ক্যাপ্টেন। তাকালো কণা মীরার নত মুখের দিকে। ভাবিয়ে রইলো একদৃষ্টিতে। চোখ তুলে তাকালো মীরা। চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। তাকালো দরজার কাছে দাঁড়ানো গার্ডের দিকে।

একটা ফার্মারিং-এর শব্দ হল কোথাও। চমকে তাকালো ম্যাকাইভার। গার্ডকে বললো, ‘কোথায় ফার্মার হল?’

‘ওরা বেড়িয়ে গেছে, ম্যাকাইভার।’—ক্যাপ্টেন বললো, ‘ওদের আটকিয়ে রাখতে পারবে না তুমি। রানা রাত দুটোর জন্তে অপেক্ষা করছিল।’

‘বেড়িয়ে গেছে! কিভাবে বেরবে! না...!’

‘বেড়িয়ে গেছে। আমিই রানাকে পিস্তল দিয়েছি।’

‘মিথ্যে কথা!’—চীৎকার করে উঠলো ম্যাকাইভার, ‘তুমি এখানে এলেই চোখে-চোখে রাখা হয়েছে তোমাকে। কখন দিলে তুমি?’

‘আমরা অকারণে কুন্তি করি নি। অকারণে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে যদি ডঃ মাসুদ ষাটকে আক্রমণ করতো তবে তোমার জীবনই সবার আগে টেনে বের করতো।’—ক্যাপ্টেন বললো, ‘ওরা পালাবে না। এ আহাজাই আক্রমণ করবে, দেখে নিও। সে শক্তি ওদের আছে...!’

‘স্টপ!’—ম্যাকাইভারের বেত এসে পড়লো ক্যাপ্টেনের মুখে। পাল কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। ম্যাকাইভার বাইরে দৌড়ে গেল। একদল গার্ড দৌড়ে আসছিল। ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা ওরাঃ-এর উদ্দেশ্যে ওরা বললো, ‘সবাই পালিয়েছে। ওরা সবাই পালিয়েছে!’

‘স্টপ ফার্মার।’—ম্যাকাইভার বিছুটা স্থির হয়ে বললো, ‘ওদের

সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকতে দাও। সুড়ঙ্গে ঢুকে গেলে সুড়ঙ্গ মুখ বন্ধ করে দেবে এল্লপ্রোড করিয়ে।’

কেবিনে ফিরে এলো ম্যাকাইভার। কোটটা তুলে নিল। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বললো, ‘ক্যাপ্টেন, ওরা পালিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে দিল। এখানে আর গার্ড রাখতে হবে না। সব ক’টাকে একসঙ্গে সুড়ঙ্গে আটকে রাখবো।’—হাসলো হাঃ হাঃ করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র কণ্ঠে বললো, ‘কিন্তু তোমাকে ছাড়বো না। সবার সামনে কুত্তার মত পিটিয়ে মারবো।’—সপাং সপাং করে বেত পড়তে শুরু করলো ক্যাপ্টেনের মুখে-গলায়। ‘বড় বাঁচার সাধ! রানার উপর খুব বিশ্বাস! রানাকেও এই জাহাজে নিয়ে যাবো, দেখে নিস্! হ্যাঁ, ম্যাকাইভার, বেগ্যা মায়ের জারজ সন্তান ম্যাকাইভার বা বলে তা করে। মাসুদ রানাকে রকেটের সঙ্গে বেধে নিয়ে যাবো। কি করে?’—হাঃ হাঃ করে হাসলো বিকট হাসি, ‘ওর প্রাণ-ভ্রমর এখনো আমার হাতের মুঠোয়। হ্যাঁ, এই স্কুনারেই এনে তুলেছি, ও পালাবার মতলব করছিল জানালার দিকে শিক কেটে। মিস্ চৌধুরী এখনো আমাদের হাতের মুঠোয়।’

ক্যাপ্টেন দিউ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাকাইভারের উপর। আঁকড়ে ধরলো শার্টের কলার, কিন্তু ম্যাকাইভার ধরে ফেললো ওর হাত দু’টো। ক্যাপ্টেনের হালকা দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের কোণে। ক্যাপ্টেন চোখ মেলাতেই দেখলো, ম্যাকাইভারের হাতে পিস্তল।

একটা বিস্ময়। সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে ভরে গেল ক্যাপ্টেনের মুখ। ব্যাপারটা বোঝার আগেই ম্যাকাইভার পিঠের কাছে কিছুটা স্পর্শ অনুভব করলো।

‘পিস্তল ফেলে দাও!’—কোচিমার কণ্ঠ।

‘মীরা, মীরা!’

‘হ্যাঁ, তুমি কথা দিয়েছিলে তুমি আমাকে ভালবাস। তুমি আমার স্বাবার কোন ক্ষতি করবেনা। তুমি কথা রাখ নি। তুমি মিস্ চৌধুরীকে এ স্কুনারেই তোমার কেবিনে আটকে রেখেছো। তুমি একটা জানোয়ার। তোমার প্রতি কোনো মাসা নেই। একটু নড়লেই গুলি করবো।’

পিস্তল ফেলে দিল ম্যাকাইভার। সঙ্গে সঙ্গে সেটা তুলে নিল ক্যাপ্টেন। খাড়া দিলে এক পাশে ফেলে দিল ম্যাকাইভারকে। ট্যাগেট করলো পিস্তল। কোচিমা উদ্দেশ্যে বললো, ‘তুই বেরিয়ে যা মা, মিস্ চৌধুরীকে নিয়ে বেরিয়ে যা।’

‘তুমি?’

‘আমি আসছি। তুই বেরিয়ে গেলেই আমি বেরিয়ে পড়বো। দেয়ী করিস না যা।’—কোচিমা একটু ইতস্ততঃ করে ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কপাল হেঁয়াল। বললো, ‘তুমি বেরুতে পারবে তো?’

‘পারবো। তুই দেখিস মা, ঠিক পারবো। বুড়ো হলে কি হবে?—তুই যা, মা।’ কপালে চুমু খেলো।

কোচিমা দরজা খুলে বের হল। এগিয়ে গেল সামনের কেবিনের দিকে। হাতে পিস্তল।

তিন নম্বর কেবিনের সামনে গাড়’। বন্-এর সজিনীকে দেখে সমীহ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। এবং বিনা বাক্যব্যয়ে দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকেই বেরিয়ে এসে কোচিমা। ওকে ডাকলো ভিতরে। গাড়’ ভিতরে আসতেই বললো, ‘দেখ তো বেডের নিচে মেয়েটা কি লুকিয়ে রাখলো।’

গাড়’ একটু ইতস্ততঃ করে হাঁটু গেড়ে বসলো। কোচিমা ওর হাতের কারবাইনটা নিয়ে বললো, ‘ভাল করে দেখ।’—গাড়’ ভিতরে

মাথা ঢুকিয়ে দিল। কোচিমা সোহানাকে ইশারা করলো কেবিনের
বাইরে যেতে। কোচিমাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালো। এবং বাইরে থেকে
দরজা বন্ধ করে দিল। সোহানা বিশ্বাসের সঙ্গে কোচিমাকে দেখছে।

দু-পা এগুতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলো দু'জন।

সামনে দাঁড়িয়ে রানা। ভেজা শরীর দেখে বোঝা যায়, এ ভূত
পানি থেকে উঠে এসেছে। কোচিমাকে দেখছে রানা।

‘ও আমাকে বের করে এনেছে।’—সংক্ষেপে এঁরচে’ বেশি কিছু
বলতে পারলো না সোহানা।

রানা সোহানাকে কাছে টেনে নিয়ে কোচিমাকেই জিজ্ঞেস করলো—
‘আপনি আপনার মত বদল করবেন, জানতাম।’

উত্তর দিল কোচিমা অন্য কথায়, ‘পানিতে নেমে যান। জাম্প!’
‘আপনি?’

‘আমি...আমার বাবাকে আগে উদ্ধার করতে হবে।’—বলে এগিয়ে
গেল কোচিমা। রানা সোহানাকে বললো, ‘তুমি পানিতে নেমে
যাও। ভয় নেই, হ্যাঙ্গারে আগুন জলে উঠবে এখন! কিছু লোকের
ওদিকে ব্যস্ত থাকতে হবে। তোমাকে কেউ দেখবে না যাও।
ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করা প্রয়োজন।’—বলে রানা কোচিমা-র পথ অনুসরণ
করলো। হঠাৎ থেমে গেলো, সে নিরস্ত। কারবাইনটা সমুদ্র পারের
রয়ে গেছে।

আগুন জলে উঠেছে হ্যাঙ্গারে। ছোটোছুট পড়ে গেছে বুনারেও।
ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে ছিটকে বের হয়ে এল একজন নেভী-পোষাক
পর্য লোক।

রানা দেখলো ক্যাপ্টেন দিউ।

কোচিমা চীৎকার করে উঠতে গেলো রানা তার মুখ চেপে ধরলো।
ক্যাপ্টেন ছুটছে। ডান দিকে এগিয়ে গেল। পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে।

সুনারের ডান দিকে ।

বাম দিকে নেমেছে সোহানা ।

কয়েকজন কারবাইন তুললো ।

ম্যাকাইভার চীৎকার করে বেরিয়ে এল বাঁ হাত চেপে ধরে । গুলি
এলগেছে ।

‘ডোন্ট শূট । গেট হিম । জাম্প ।’

দু’জন পানিতে জাম্প করলো ।

কোচিমাকে ছাড়লো না রানা । টেনে নিয়ে এল অস্ত্রধারে ।
আশ্বে করে দু’জন নেমে পড়লো পানিতে । কোচিমা বললো,
‘বাবার কি হবে ?’

‘পাড়ে উঠে ভাবতে হবে ।’—রানা সাঁতার কাটতে কাটতে উত্তর
দিল ।

সোহানা কিছুদূর এগিয়ে এসে পানিতে ভেসে ছিল । রানাদের
আসতে দেখে ও এগিয়ে গেল আরো কিছুদূর নিঃশব্দে সাঁতার কেটে ।
অন্ধকারে হুঁচু পানিতে এসে দাঁড়ালো ওরা । উঠে এল পাড়ে ।
কোচিমা দাঁড়িয়ে পড়ে দূরের সুন্যার দেখছিল । বললো, ‘ওরা বোধ
হয় বাবাকে ধরে ফেলেছে ।’

কোচিমা কাঁদছে ।

রানা সান্তনা দিতে গিয়ে সময় নষ্ট করলো না । কিন্তু সোহানা
ধরলো মেয়েটাকে । বললে, ‘কৈদো না ।’

ভীষণ ভাল লাগলো সোহানাকে দেখতে, ওর কণ্ঠস্বর শুনতে,
ওর এই সান্তনা, ওর অনুভূতি সব সুন্দর । রানা বুঝলো সবচে’ সুন্দর
মেয়েটির এই বঁচে থাকা । সোহানা বঁচে আছে, ইচ্ছে করলেই
রানা ওকে ছুঁয়ে দেখতে পারে ।

‘চল এগিয়ে যাই ।’—রানা বললো ।

কোচিমা বললো, ‘আমিও যাবো ?’

‘হ্যাঁ ।’

‘না !’

‘কেন ?’

‘বাবাকে ওদের হাতে —।’

‘এটাই তোমার বাবার ভাগ্য ছিল ।’

‘না, ছিল না । আমি ঘটয়েছি ।’

‘যা ঘটে গেছে তাকে অস্বীকার করতে পারো ?’

‘না, পারি না ।’—কামা থামিয়ে কোচিমা চিন্তিত কণ্ঠে বললো,

‘ম্যাক বাবাকে মারতে নিষেধ করলো কেন ?’

‘কারণ নারে ক্যাপ্টেন থাকলে আমি সুইশাইফ বাটনে চাপ দিতে ইতস্ততঃ করবো ।’

‘রকেট সত্যি সত্যি আম’ত ?’—কোচিমার কণ্ঠে অবিশ্বাস ।
বললো, ‘ম্যাক নিজে পরিক্ষা করে দেখেছিল—।’

‘ম্যাক পৃথিবীর বোকা লোকদেরই একজন ।’—রানা বললো,
‘নইলে আজ রাতের কথা ভেবে দেখত । এতগুলো লোককে সামনে
বৃত্ত্য ঝুলিয়ে রেখে বন্দী রাখা যায় না ।’

কথা বলছিল ওরা অন্ধকারে চলতে চলতে । উত্তরের পাহাড়
দেঁবে এগুচ্ছে ওরা । উদ্দেশ্য : সুড়ঙ্গ-মুখ ।

গুলির শব্দ শোনা গেল । গুলি বিনিময় হচ্ছে সুড়ঙ্গমুখে । দাঁড়িয়ে
পড়লো রানা । বললো, ‘কে জানে ক’জন গুলি থাকবে ।’

‘এ গুলি ওরা চালাচ্ছে না ?’—কোচিমা বললো, ‘ওরা গুলি
করবে না । সুড়ঙ্গে ঢুকিয়ে এপাশের মুখটা সিল করে দেবে ।’

‘ওপাশ ?’

‘সিলড ।’—কোচিমা বললো, ‘সহ্যায় ওরাং সিল করেছে ।’

এবার গতিবেগ বাড়লো রানার। ওখানে পৌঁছুতে হবেই।
সোহানা রানার খায় ঘেঁষে এলো। বললো, 'তোমার কষ্ট হচ্ছে
হাতের ব্যথার?'

'না। তোমার?'

'আমার তো কিছুই হয় নি!—সোহানা বললো, 'আমার কাঁধে
ভর দিয়ে হাঁটবে?'

'আমার ভার সহিতে পারবে?'—রানা হাসলো। এবং সত্যি
সত্যি সে তার ডান হাতটা তুলে দিল ওর কাঁধে। সোহানা
আসলে রানার কাছে কাছে থাকতে চায়। সোহানাই রানার
শরীরের সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে চললো। ও তুলে গেল রানার ব্যথার
কথা। ওর শূধু ভাল লাগলো এই নিভরতা। স্বাক্ষরে আঙুল
দাট দাট করে জলছে চারদিক আলোকিত করে। আলোর
পুরো জারগাটো আলোকিত। এদের লোক ছুটোছুটি করছে। রানার
অনেক দূরে, এখানেও আলো পৌঁছচ্ছে।

জুড়দের কাছাকাছি এসে দেখলো ওয়াং সামনে একদল লোক
নিম্নে ব্যস্ত। রানা পাহাড়ের একটু উপরের তাকে উঠে গেল। একটু
পাথরের চাঁই দেখিয়ে ওদের বললো আড়ালে বসতে।

কিছুদূর এগিয়ে গেল ও হামাগুড়ি দিয়ে। আরেকটা ছোট চাঁই
বেছে নিয়ে তার উপরে কারবাইন রাখলো। বসে পড়ে প্রথমেই তাক
করলো ওয়াং-এর অদূরে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কারবাইনধারীদের
দিকে।

ওয়াং টর্ট জলে কিছু একটা করছে। এক্সপ্রোসিভের ফিউজ লাগাচ্ছে।
আলো লক্ষ্য করে সেফটি ক্যাচ টেনে দিয়ে ট্রিগার চেপে ধরলো।
অটোমেটিক কারবাইন থেকে বেরিয়ে গেল সাতটা গুলি। আলো
নিভে গেল। আতর্জনাত শোনা গেল। এবং সব কটা লোক মাটিতে

শুয়ে পড়ে এদিকে গুলি চালালো। হামাগুড়ি দিয়ে সোহানাদের কাছে চলে এলো রানা। দু'মিনিট অপেক্ষা করলো। আর কোনো গুলি হল না। আরো উপরে উঠে এল ওরা। অস্ত্র একটা কোণে। আবার অপেক্ষা করতে লাগলো। হ্যাঁ, ওরা এবার তৈরী হচ্ছে গ্রেনেড ছুঁড়বার জন্তে। রানা অপেক্ষা করলো।

একজন কিছু একটা ছুঁড়ে-দিল এদিক লক্ষ্য করে। মাটি ক'মড়ে কয়েকটা মুহূর্ত পড়ে থেকে আবার গুলি চালিয়ে দ্রুত সরে গিয়ে বসে পড়লো রানা আরেকটা টাই এর আড়ালে। আবার গুলি চলেলো।

ওরা সুড়ঙ্গ-মুখ থেকে সরে পাহাড়ের ধারে চলে আসছে হামাগুড়ি দিয়ে। রানা অপেক্ষা করতে লাগলো সুযোগের।

আরো এগিয়ে গেল সামনে। এমন সময় ফারারি হল দক্ষিণদিক থেকে।

মাটি আঁচড়ে শুয়ে পড়লো রানা। এক সময় খেয়াল হল, গুলি তাদেরকে লক্ষ্য করে হচ্ছে না। সুড়ঙ্গের ভিতর থেকেও কেউ গুলি করছে না। গুলি হচ্ছে দক্ষিণদিক থেকেই এবং ওরা'দের উপর।

কারা?

দেখলে, ওরা এখন দক্ষিণদিক থেকে আত্মরক্ষার জন্তে ব্যাটিকেড গড়তে চাইছে। ছুটছে। গুলি চালালো রানা ওদের দিকে আশঙ্কিত ভর করে। সুড়ঙ্গের কাছাকাছি বিক্ষোভ হল কয়েকটা।

এবার পালাচ্ছে ওরা।

ছুটছে, হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে কণ্ট্রোল-রুমের দিকে।

'কারা আছে ওদিকে?'—রানার পাশ থেকে জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

ভাবছিল রানাও : কারা?

উত্তর দিল কোচিমা, 'আমার মনে হয়, ওরা পিকপ্যাডারের জু।'

‘আমরা এবার সুড়ঙ্গে যেতে পারি না ?’—জিজ্ঞেস করলো সোহানা ।

‘না ।’—রানা বললো, ‘ওদের কেউ হয়তো লুকিয়ে থাকতে পারে, বার পালাতে ভয় পাচ্ছে । তাছাড়া স্বেম-সাইডও হতে পারে ।’

আটঘণ্টা ওর পাশাপাশি বসে রইলো । সোহানাই দু’-একটা কথা বলছিল মাঝে মাঝে । রানা দেখছিলো ছাফারের আঙন । রানার খাশা হল, এ আঙন বহুদূর থেকে দেখা যাবে । দেখবে ম্যাকাইভারের জাহাজের বাইনোকুলার, দেখবে চাইনিজ নেভীর টেলদারী জাহাজ । তারা আগে পৌঁছুবে ?

‘রানা !’—সোহানার উত্তেজিত কণ্ঠ ।

‘কি হল ।’

‘ঐ দেখ ।’

রানা, দেখলো, ওপাশ থেকে কয়েকজন এগিয়ে আসছে হামাঙড়ি দিয়ে । ওরা সুড়ঙ্গে ঢুকবে ।

আরো এগিয়ে গেল ওরা । সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল একঝাঁক গুলি !

ওরা পিছিয়ে এল ।

ওদের কেউ চীৎকার করে কিছু বললো । উত্তরে গুলিই বের হয়ে এল আবার ।

ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে । লুকিয়ে পড়লো পাহাড়ে ।

সুড়ঙ্গে ঢোকা সহজ নয় । শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে নেভীরা, নিজেদের বিরুদ্ধেই !

রানা বুঝলো, আজ সুড়ঙ্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয় । এদিকে কোথাও লুকিয়ে আছে শত্রু । ওপাশে অনেকা আবার সুড়ঙ্গে অতি সাবধানি বন্ধ !

‘এখানেই কাটাতে হবে রাতটা !’—রানা বললো ।

‘স্বপ্নের চেয়ে এখনটাই ভাল।’—সোহানা মহাত্মির সঙ্গে মত
দিল। কোচিমা একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসেছে ওপাশে।

সবাই সকালের প্রতীক্ষা করছে।

অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলো রানা। রানার মুখের দিকে তাকিয়ে
আছে সোহানা একভাবে।

কোচিমা কিছুই দেখছিল না। দেখছিল অন্ধকার।

ভাদ্রারটা পুড়তে পুড়তে নিভে গেল যেন। সোহানা রানার হাত
থেকে কারবাইনটা সরিয়ে রেখে পাথরে হেলান দিয়ে রানার মুখোমুখি
হলো। রানার ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে দেখলো। হাসলো। বললো
রানা, ‘কি অন্ধুত রাত, না?’

‘হ্যাঁ, অন্ধুত রাত।’—ভাদ্রারের আগুন নিভে যাওয়াতে আকাশটা
সাদাটে—কেমন যেন লাগছে। একটা নীরবতা চারদিক কেমন যেন
আঁকড়ে ধরেছে। সোহানা কথা বলে সেটাকে হালকা করতে চাইছে।

‘দেশে ফিরে সব কথা মনে থাকবে তোমার?’—সোহানা জিজ্ঞেস
করলো।

‘যদি দেশে ফিরতে পারি সব কথা লিখিতভাবে রিপোর্ট করতে
হবে...’—রানা তাকালো কোচিমার দিকে। ‘জেনারেলের কাছে’ কথাটা
বললো না।

‘যুমুছে’—সোহানা বললো।

রানার মনে হল, ঘুমাতে পারে না মেয়েটা। ওর ঘুম নেই। ও
ঘুমাতে চাইলেও ঘুমাতে পারবে না।

‘রানা!’—সোহানা ডাকলো।

‘বল।’

‘কিছু না’—বলে মাথাটা এলিয়ে দিল পাথরের উপরে। রানা
আরো কয়েক মিনিট অন্ধকারে চেয়ে থেকে সোহানার পাশে আবার

পাথরটাতে হেলান দিল ক্রান্তিতে। রানা বুঝতে পারছে তার সমস্ত শক্তি শেষ হ'ল আসছে।

নড়ে বসলো সোহানা। রানার মাথার নিচে হাতটা দিয়ে বুকের উপর টেনে নিলো মাথাটা। নরম বুকের উষ্ণ সান্নিধ্য। আপত্তি করলো না রানা। অনুভব করছে বুকের স্পন্দন। বেঁচে থাকার স্পন্দন। আঙুল চুষের ভেতরে বিলি কেটে চলেছে। ওর উষ্ণ শ্বাস লাগছে গালে

মাথ' তুলে তাকালো।

'স্বপ্নবে না?'—সোহানা যদুকণ্ঠে বললো।

'না

'তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে জরে'—সোহানা আবার মাথাটা টানলো। কারবাইনট' তুলে নিল কোলের উপর। বললে, 'আমি পাহারা দেবো, তুমি ঘুমতে চেষ্টা কর।'

'না।'—রানা আকাশের দিকে তাকালো। বললে, 'তারচে' বরং তুমি গরর বল সংগ্রহ কাটবে।'

'গর...?' আমার কোন গররই মনে পড়ছে না।'

'প্রেমের গর - প্রেমে পড় নি কোনোদিন।'

'পড়েছি।'—সোহানাও আকাশের দিকে তাকালো, 'মন দেয়া নেয়ট' অেক করছি, মগেহি হাজার মরণে...কিন্তু...।'

কন্তু ক

১. তুমি ওসব শুনতে চেষ্টা না

'কেন?'—রানা বললো, 'এখন বুঝি মরতে ভয় পাও?'

'পাহা ভীষণ ভয় পাই।'—সোহানার বিষয় কণ্ঠ, 'অথচ মরতে চাই। এই মুহূর্তেই মরতে চাইছিলাম।'

'তবে ভয় কেন?'

‘তোমাকেই যে ভয় পাই!’—সোহানা রানার চুলে মুখ ঝুঁজে গছ
নিল ডাকলো, ‘রানা, রানা!’—অশ্রুট উচ্চারণ।

রানা কোন কথা বললো না। চোখ বুঁজলো বুকে মাথা রেখেই।
তার শক্তি প্রায় নিঃশেষ।

রানার তল্লা মত এসেছিল, বুঝতে পারলো যখন তল্লা ভেঙে
দেগল।

সোহানা উঠে বসেছে এক ঝটকায়। তাতেই তল্লা ভেঙেছে।

রানা উঠে বসেই বুঝলো সোহানার চমকে উঠে বসার কারণটা।
সকালের আলো পূর্ব আকাশটা লালচে করে তুলেছে। আবহা অন্ধ-
কারে চকচক করছে কোচিমার হাতের কারবাইন।

কোচিমা বললো, ‘নড়বেন না।’

রানা হতবাক হয়ে থাকিয়ে রইলো। পিছনে সরে যাচ্ছে কোচিমা,
লক্ষ্যস্থির হয়ে আছে ওদের দু’জনের উপর।

১২

একটা মোটামুটি দূরত্বে গিয়ে পাথরের টাইলোর ফাঁকে ফাঁকে নিচে নেমে গেল কোচিমা। উপরে ফিরে তাকালো না আর একবারও।

পিছন ফিরে দেখলো রানা পিঙ্ক-প্যাশ্বারে চক্চক্ করছে ‘পিকিং ডাক’ সকালের আলোয়।

মাঠে এগিয়ে আসছে কয়েকজন। দু’জনকে চিনলো। ম্যাকাইভার এবং সবার আগে আগে আসছে ক্যাপ্টেন দিউ। ওয়াং নেই।

কোচিমা নেমে গিয়ে একটা পজিশন নিল। ওদেরকে গুলি করবে?

ক্যাপ্টেন! এদিকে আসছে কেন? কাছে এগিয়ে এল ওরা। এবার দেখলো রানা, ক্যাপ্টেনের পিঠের সঙ্গে চেপে ধরে রয়েছে কার্ভবাইন। স্টিক হয়ে এগুচ্ছে ক্যাপ্টেন।

সুড়ঙ্গ-মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। কয়েকটা মুহূর্ত। ম্যাকাইভার চীৎকার করলো, ‘কোচিমা, বেরিয়ে এসো!’

‘কোচিমা !...মীরা দিউ, মিস্ দিউ তোমার পিতা’র প্রতি কোন দয়া-
ভালবাসা থাকলে বেড়িয়ে এস। নইলে ক্যাপ্টেনকে গুলি করা হবে।’

একটা গুলি করলো কোচিমা। কারো গায়ে লাগলো না। আর
কাউকে গুলি করতে চায় নি কোচিমা, গুলি করতে চেয়েছিল
ম্যাকাইভারকে।

এখন ম্যাকাইভার দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেনের গিছনে।

‘মীর, বেরিয়ে এসো...’

‘মীরা, আসিস না !’—চীৎকার করে বললো ক্যাপ্টেন দিউ, ‘মীর,
দু’জনকেই খুন করবে ওরা ! তুই আসিস না।’

‘মীরা, বের হয়ে এসো। আমরা তোমার বাবাকে ছেড়ে দেব’,
বেরিয়ে এসো।’

‘মীর, ভুল করিস না।’—ক্যাপ্টেন বললে, ‘মাসুদ রানা, মীরা’কে
বের হতে দেবেন না। ওকে আপনি আপনার সাথে নিয়ে যাবেন।
ওকে এখানে আসতে দেবেন না।’

রানা উঠে দাঁড়াতে গেল, সোহানা কিছুতেই উঠতে দিল না।
ফিসফিস করে বললো, ‘তোমাকে বাইরে দেখলেই ওরা গুলি চালাবে।
ম্যাকাইভার প্রতিশোধ নেবে।’

‘মাসুদ রানা।’—এবার ম্যাকাইভার ঘোষণা করলো, ‘শেষ বারের
মত বলছি, মীরা’কে বের করে দিন। নইলে ক্যাপ্টেন দিউকে হত্যা
করতে বাধ্য হবে।’

রানা এবার উঠে দাঁড়ালো।

‘ম্যাকাইভার !’

রানার কণ্ঠে সবাই পাহাড়ের এই অংশে তাকালো। রানা বললো,
‘আমরা বাইরেই অনেক লোক রয়ে গেছি। আমরা তোমাকে,
তোমার লোকদেরকে গুলি করে ঝাঁঝ করা করে দিতে পারি। তুমি

দু'জনের কাউকে নিয়ে যেতে পারবে না।'

ম্যাকাইভার চারদিকে তাকালো। লাইম-স্টোনের চাঁইগুলো দাঁত
যের করে আছে তার দিকে।

ম্যাকাইভার আরো কাছ ঘেঁষে দাড়া লা ক্যাপ্টেন দিউ-এর।
বললো, না, তা পারবে না, মাসুদ রানা। ম্যাকাইভার জিতবেই।
তোমাকে চিনি। তুমি বড় কৃপণভাবে জিততে চাও, দলের কাউকে
হারাতে চাও না। কিন্তু আমি জেতার জন্যে নিজেদেরই পণ করতে পারি
এবং ধরেছি। আমার দলের পঁচিশজন কাল মরেছে। আমার
অস্ত্রশস্ত্র বন্ধু ওয়াংও মরেছে। আমার আর হারাবার কিছু নেই।
তাই আমি জিতবোই। তোমার লোক ক্যাপ্টেন দিউকে হত্যা
করবে না। তুমিও করবে না। তাই আমি আমার বান্ধবীকেই নিয়ে যেতে
চাই। ক্যাপ্টেনকে ছেড়ে দেবো কথা দিচ্ছি।'

'মীর', এই শব্দতানটাকে বিশ্বাস করিস না?'—আবার চীৎকার
করে বললো ক্যাপ্টেন।

রানা বসে পড়লে। দেখলো তার দিকে তাকিয়ে আছে মীরা
ফ্যালফ্যাল করে। রানা বললো 'মীরা, যেও না!'

ম্যাকাইভার বললো, 'দশ গোণা শেষ হগেই ক্যাপ্টেনকে গুলি
করবো! এক...দুই...তিন...!'

মীরা আবার তাকালো রানার দিকে। রানা এবার কিছুই বলতে
পারলো না। মীরা উঠে দাঁড়িয়েছে কারবাইন ছেড়েই।

এক পা দু'পা করে এগিয়ে যাচ্ছে মীরা। সূর্যের আলো পড়ছে
মুখের ওপর। চুলগুলো একচোখ ঢেকে দিয়েছে। ম্যাকাইভারের
দশ হাত দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। তারপর হঠাৎ ছুটে গিয়ে
পড়লো ক্যাপ্টেনের বুকে। ক্যাপ্টেন শুক হঠে দাঁড়িয়ে আছে।
তার চোখে পানি নেই, হাত উঠলো না আদর করতে।

মীরা ক্যাপ্টেনের গালে চুপু খেল। কোটের খোলা বোতামটা লাগিয়ে দিল। ওর কথা শুনতে পেল না রানা।

ক্যাপ্টেনকে সরিয়ে দিল ম্যাকাইভার। পিস্তল এখন কোচিমার উপর ধরা।

‘নাওচি, আকিকো!’—ম্যাকাইভার ডাকলো এবার।

রানা চম্কে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দাঁড়াতে পারলো না। শঙ্কর বুক কঁপে গেল। ভয় গিরগির করে উঠলো।

‘নাওচি, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে?’—ম্যাকাইভার বললো, ‘তোমার প্রিয় ক্যাপ্টেনকে রেখে গেলাম। তার মেয়ে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন পৃথিবীর সবকিছুর বিনিময়ে যে জিনিসটি চায়, তা হল তার মেয়ে মীরার জীবন। আমরা চলে যাচ্ছি, তার মেয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে। মেয়েটাকে রক্ষার দায়িত্ব তোমাদের। আমরা জানি, ক্যাপ্টেন রকেটে থাকলেও এলপ্রোড করতে না মান্দ রানা। তবু তার মেয়েকেই নিলাম। এখন ক্যাপ্টেন নিজেই তার মেয়েকে রক্ষার দায়িত্ব নেবে। আমরা কথা দিচ্ছি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই ক্যাপ্টেন তার মেয়েকে ফেরত পাবে।’—ম্যাকাইভার দম নিয়ে বললো, ‘মান্দ রানা, আমার কথা শুনতে পেয়েছে। আশাকরি।’

কোনো উত্তর দিল না রানা।

ম্যাকাইভার হাসলো। তারপর বললো, ‘আপনার প্রিয় বন্ধুকে ফেরত দিয়ে গেলাম, আপনার খুশী হবার কথা। মীরাকে নিয়ে যাচ্ছি দুই কারণে—প্রথম কারণ, ক্যাপ্টেনের দশজন সশস্ত্র লোক ওহায় প্রবেশ করতে পারে নি। মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তি ক্যাপ্টেনের আছে। দ্বিতীয়তঃ, মীরা সাউথ-ইস্ট এশিয়ার সি. আই. এ. নেট ওয়ার্ক সম্পর্কে অনেক কিছু জানে।’

মীরাকে সামনে রেখে ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ।
ক্যাপ্টেনের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে ম্যাকাইভার কারবাইনটা ।

ম্যাকাইভার চলে যাচ্ছে ।

উঠে দাঁড়ালো রানা । দেখলো, পাহাড়ের ওপাশ থেকে নেমে আসছে নাওটির দল । এরাই কাল বাঁচিয়েছে স্ফুদের মানুষগুলোকে ।
ক্যাপ্টেন পিছন ফিরলো না । কারবাইনের মুখ নিচের দিকে ।
নাওটি ও আকিকো ক্যাপ্টেনের দু'পাশে দাঁড়ালো । আরো আট-
জন লোক দাঁড়ালো স্ফুদ-মুখ কভার করে ।

রানা দেখলো, ক্যাপ্টেন এখনো দাঁড়িয়ে আছে একভাবে ।
একবারও পিছন ফিরে দেখে নি । দেখলো না, তার মেয়ে চলে
গেল । চলে গেল তার পিতৃ-প্যাথর ।

পাথরের আড়াল থেকে দু'পা বাড়তেই রানা দেখলো, সবগুলো
কারবাইন তার দিকে উদ্ভত ! দাঁড়িয়ে পড়লো ।

‘মিস্টার মাসুদ !’- নাওটি বললো, ‘নড়বার চেষ্টা করবেন না ।
কন্ট্রোল রুমে যাবার চেষ্টা করারও কোন মানে নেই । কেন আপনারকে
না বললেও বুঝতে পারছেন ।’

রানা কোন কথা না বলে বসে পড়লো পাথরের গায়ে হেলান
দিয়ে । দাঁড়াবার শক্তিও তার নেই ।

ভলির শব্দ হতেই রানা উঠে দাঁড়ালো । দেখলো, ওরা স্ফুদ-
মুখে ভলি চালিয়েছে । নাওটি চীৎকার করে বলছে, ‘কেউ বেরুতে
চেষ্টা করবেন না !’

উঠে দাঁড়ালো সোহানা । রানাকে বসিয়ে দিল । রানা কোন
কথা বললো না । চোখ বুঁজে রইলো । মিনিট কয়েক পরে তাকালো ।

দেখলো সোহানাকে। ভিজ্জেস করলো 'সোহানা, সেদিন ঘুমের ঘোরে কার নাম বলেছিলাম?'—একটু হাসি দেখ' গেল রানার ঠোঁটের কোণে। রাস্তা বিষন্ন হাসি।

পানিতে ডরে উঠলো সোহানার চোখ। বুঝতে পারছে রানা' পুরো ঘটনা, ক্রান্তি যন্ত্রণা ভুলতে চায়। ভুলাতে চায় তাকে। সোহানা উত্তর দিল না।

রানা হাত বাড়িয়ে সোহানার গালের দু'পাশে বেয়ে আসা চুল-ডলো সন্নিবেশ দিল। বললো, 'বল।'

ডেজা চোখেই হাসলো সোহানা। বললো, 'যেজর জেনারেল। তোমার প্রাণ-প্রিয় বৃদ্ধো।'

'নিশ্চয়ই খুন করতে চাইছিলাম।'

'না।'—সোহানা লাল হয়ে উঠলো। বললো, 'বলছিলে, হানিমুনে আমি ওই বিচ্ছু মেয়েটার সঙ্গে কিছুতেই যাবো না।'

'মিথ্যা কথা।'—বৃদ্ধকণ্ঠে বললো রানা। তাকিয়ে রইলো সোহানার মুখের দিকে। আবার বললে, 'আমি ওকথা বলতেই পারি না।'

সোহানা চোখ ডরে হাসলো। কিছু বলতে যাবে অমনি শুনলো—

'ডঃ মাহমুদ!'—ক্যাপ্টেন দিউ ডাকছে।

রানা উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'ক্যাপ্টেন!'

'রকেট আর্মড?'

'আর্মড!'—রানা বললো।

ক্যাপ্টেন কোন কথা বললো না। কারবাইনটা ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল। কণ্ট্রোল-রুম তার উদ্দেশ্য। প্রথমে নাগুচি, আকিকো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর সুড়ঙ্গ-মুখ ছেড়ে অনুসরণ করলো ক্যাপ্টেনকে।

এগিয়ে চলেছে ক্যাপটেন।

সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে এল ওরা। রানাকে দেখে ওরা চীৎকার করে উঠলো। রকেট না দেখে বিস্মিত হলো।

গুলির শব্দ ভেসে এল কন্ট্রোল-রুমের দিক থেকে। ডঃ বরকত বললো, 'কি ব্যাপার?'

রানাও এগিয়ে গেল দ্রুত। ছুটে গিয়ে বুঝলো তার শক্তি নেই। হাঁটতেও পারছে না। সোহানা ধরে ফেলেছে ওকে।

'ক্যাপটেন দিউ কন্ট্রোল-রুমের দরজা খুলছে।'—রানা বললো। ডঃ বরকত দ্রুত পাশে এগিয়ে গেল সেদিকে। তার আগে আগে কমোডোর জুলফিকার দল নিয়ে ছুটে চলেছে। বিজ্ঞানীদের স্ত্রীরা স্বামীর হাত ধরে হাসছে। বিদেশীরা চুমু খাচ্ছে। এত ক্রান্তি, অস্বস্তির ভেতরেও ওরা খুশীতে বলমল করছে সকালের রোদে। ক্লাস্ত চোখে ওদেরকে দেখতে ভাল লগছিল রানার। ডঃ সেলিম খান হাত নাড়লো। মিসেস খান আগের মতই আছেন। তিনিও হাসলেন।

সোহানা রানাকে একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি ডাক্তারকে ডাকি...'

বলমল আলায় আরো একটা আলোর বলকানি সবাইকে চমকে দিল। কয়েক সেকেন্ড পর প্রচণ্ড একটা শব্দ চারদিকে ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হল।

সোহানা একটু এগিয়ে গিয়েছিল।

'রানা!—ছিটকে পড়ে যাচ্ছিলো সোহানা। ধরে ফেললো রানা ওকে।

'কি হলো!—রানাকে জড়িয়ে ধরে কোনমতে জিক্সেস করলো সোহানা।

‘পিকিং ডাক এক্সপ্লোড করলো ।’— ক্লান্ত স্বর রানার ।

‘মানে, কোচিং...!’

‘হ্যাঁ, মীরা দিউ...’

‘না, রানা ! বলো, না ।’—রানার মুখে হাত চাপা দিল সোহানা ।
কাদহে ও মুখে দু’হাত চেপে । উঠে দাঁড়ালো রানা । দেখলো—
সবাই ছুঁছে পাহাড়ের দিকে । পাহাড়ের তাকে উঠতে চাইছে সবাই ।
কন্ট্রোল টাওয়ার থেকেও সবাই ছুটছে পাহাড়ের দিকে ।

দেখলো, পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে ছুটে আসছে সমুদ্র । এখনো
অনেক দূরে । রানা বললো, ‘সোহানা, দেখ—টাইডাল বোর !’

সোহানার কাঁটা বন্ধ হয়ে গেল । বললো, ‘এখানে, এত উঁচুতেও
আসবে পানির স্রোত ?’

‘আসতে পারে, আমাদের ধরে থেকে । যেখানে বাই এক সঙ্গে
ভেসে যাবো । কি বল ?’

সোহানা জড়িয়ে ধরলো রানাকে । রানাও ধরলো ওকে । চোখ
বুঁজে টেউয়ের প্রতিক্ষা করছে সোহানা । শব্দ, সমুদ্রের ডাক কানে
আসছে । রানা হাসছে, কিন্তু চোখ মেললো না সোহানা ।

পাঁচ মিনিট পরে চোখ মেলে দেখলো, পাহাড়টা হীপের মত
জেগে আছে, আর সব পানির নিচে একাকার ।

‘আর একটু নচে থাকলেই আমরা এতক্ষণ সমুদ্রের মাঝখানে...’
—রানা বললো ।

দু’জন এক সঙ্গেই থাকতাম তো ?’

‘হঁ’ :—রানা হাসলো, ‘কিন্তু দু’জন এক সঙ্গে বাঁচতে চাই, মরতে
নয় । তুমি ?’

‘আমিও ।’—সোহানা বললো ।

গভীর ঘুমে অচেতন রানা ও সোহানা। পানি সরে গেছে। সবাই বেরিয়ে এসেছে। চীৎকার করে খুশী প্রকাশ করছে। কয়েকটা প্লেন থেকে পক্ষাশ জনের মত প্যারাট্রুপার নামছে। নামছে খাবারের বাঙিল।

কমোডোর এসে দাড়িয়েছে ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে।

ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে দু'জনের কপালে হাত দিয়ে বললো, দু'জনেরই গারে প্রচুর জ্বর।'

চোখ মেলে তাকায় সোহানা। ফ্যালফ্যাল করে সবার দিকে চরে থাকে।

চোখ মেলে রানা।

'কংগ্র্যাচুলেশন, মাই বর।'—ডঃ খান ও এস দাড়িয়েছেন।

'কংগ্র্যাচুলেশন।'—অস্পষ্ট কাণে রানা বললো, 'ইয়েস, থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু কংগ্র্যাচুলেশন আমার প্রাপ্য নয়। ওটা জানান ডঃ বরকত এবং ক্যাপ্টেন দিউকে।

উত্তর নেই।

রানা দেখলো, কমোডোরের মুখের হাসি নিভে গেছে। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'স্বার, ক্যাপ্টেন দিউ কেমন আছে ?

'ক্যাপ্টেন দিউ আত্মহত্যা করেছেন বাটন টিপে দিয়েই।'





গুপ্তচক্র

সলিড ফুয়েল এম্পাটের ছদ্মবেশে চললো রানা।
প্রশান্ত মহাসাগরের একটি ছোট দ্বীপে। সস্ত্রীক !
বন্দীদশ। থেকে পালিয়ে নিশ্চিত আশ্রয় পেল ওরা।
আপনভোল। এক প্রফেসরের কাছে।

তারপর ?

তারপর শুরু হলো রানার জীবনের ভয়ঙ্করতম
সংঘর্ষ। উন্মোচিত হলো গুপ্তচক্রের সাজ্জাতিক
সর্বনেশে এক পরিকল্পনা। বাইরে থেকে সাহায্যের
কোন সম্ভাবনা নেই। প্রচণ্ড শক্তিশালী গুপ্তচক্রের
আস্তানায় বন্দী মাসুদ রানা।

 মূল্য : সাত টাকা মাত্র

 সেবা বই
সেরা বই
অবসরের সঙ্গী